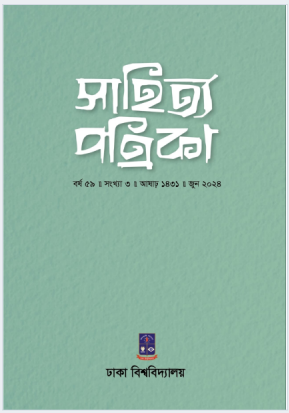

Vol. 59 | No. 3 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লালসালুর জমিলা: পাঠের সংস্কৃতি ও পূর্ববাংলার সমাজ-পাঠের এক পর্ব

Volume	59
Issue	3
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mohammad Azam
Published online	April 30, 2025
DOI	10.62328/sp.v59i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i3.1
Pages	1-27
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩১॥ জুন ২০২৪
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i3

DOI: 10.62328/sp.v59i3.1
প্রবন্ধ জমাদান: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পৃষ্ঠা: ১-২৭

*লালসালু*র জমিলা: পাঠের সংস্কৃতি ও পূর্ব বাংলার সমাজ-পাঠের এক পর্ব

মোহাম্মদ আজম
মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি
ইমেইল: mazam1975@hotmail.com

সারসংক্ষেপ

বর্তমান প্রবন্ধে পরস্পর সম্পর্কিত দুটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবিত হয়েছে। এক দিকে *লালসালু* উপন্যাসের একগুচ্ছ পাঠ পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে, প্রধান পাঠ-প্রবণতা এবং এই সূত্রে জমিলা চরিত্র সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোটেই টেক্সট সমর্থিত নয়। অন্য দিকে, মুখ্যত নব্য-সমালোচনা এবং গৌণত চিহ্নবিদ্যা ও ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের সূত্র ধরে দেখানো হয়েছে, *লালসালু* বাস্তববাদী উপন্যাস নয়, আর জমিলাও প্রতিবাদে 'সক্রিয়' চরিত্র নয়। প্রকরণ-প্রকৌশলের মতো ভাবগত স্তরেও উপন্যাসটি নিরীক্ষাধর্মী; আর সামাজিক ভাষায় জমিলার অনধিগম্যতাই চরিত্রটি নিয়ে উপন্যাসের উচ্চাভিলাষী আয়োজনের মূল ভিত্তি। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রবন্ধে *লালসালু* পঠিত হয়েছে মুখ্যত 'প্রকৃতিপ্রতিম' জমিলাকে কেন্দ্রে রেখে; দেখানো হয়েছে, মজিদের পরাজয় আদতে প্রতীকী—*লালসালু*র মশহুর পাঠকগণ যেভাবে জমিলার সক্রিয় ঘৃণায় বিপর্যস্ত মজিদের কল্পনা করেছেন, সে রকম কিছু ঘটেনি। বরং জমিলার 'নিষ্ক্রিয়' সক্রিয়তা উপন্যাসটিকে এক বহু-সম্ভাবনাময় কাঠামোর আকার দেয়, যা একে জীবনের বহু-পাঠসম্ভব নিরীক্ষাক্ষেত্রে উন্নীত করে। টেক্সটে বিকীর্ণ চিহ্ন উদ্‌ঘাটন করে প্রবন্ধটিতে আরো দেখানো হয়েছে, *লালসালু*র সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠ আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের দীনতা যেমন নির্দেশ করে, তেমনি পূর্ববাংলার সমাজ-পাঠের কিছু প্রভাবশালী দৃষ্টিভঙ্গিও উন্মোচন করে।

মূলশব্দ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *লালসালু*, জমিলা, পাঠ-সূত্র, নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ, নব্য-সমালোচনা, ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস *লালসালু* প্রধানত পঠিত হয় মজিদকে কেন্দ্র করে, এবং এর বিকল্প কোনো পন্থা নির্ধারণ করা মোটেই সহজ নয়; কারণ, চরিত্র-প্রধান উপন্যাসে মুখ্য চরিত্রের জন্য যতটা পরিসর আর কার্যকরতা সাধারণভাবে নির্ধারিত হতে দেখা যায়, *লালসালু*র মজিদ বরাদ্দ পেয়েছে তার চেয়েও বেশি। উপন্যাসটি, বিষয়গত কারণে সম্ভবত, বাংলাদেশের সামাজিক ভাষার অংশ হয়েছে, আর এর সমালোচনা-পর্যালোচনায়ও এ বাস্তবতার গভীর প্রভাব পড়েছে। ভালো-মন্দের ধারণাকে যদি নিরিখ হিসাবে ধরি—সামাজিক পরিসরে যেভাবে দেখা ছাড়া প্রায়ই গত্যন্তর থাকে না—তাহলে মজিদকে মন্দের কোটায় না ফেলে পারা যায় না। কিন্তু সমাজ মন্দের বিপরীতে একটা ভালোর উপস্থিতিও দাবি করে। মজিদের বিপরীতে এভাবেই সাধারণত জমিলার আবির্ভাব ঘটে। 'ধর্ম' ও 'নারী', এবং আরো ভালোভাবে বললে 'ধর্ম-কবলিত নারী' বাংলাদেশের ভদ্রলোক-সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার খুব গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। *লালসালু*র জমিলায় এ দুইয়ের একত্র-উপস্থিতি বহু সমালোচকের আগ্রহের কারণ হয়েছে। এর সাথে অনিবার্যতই যুক্ত হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্র—ধর্মকে প্রধান 'ইডিয়লজিকেল স্টেট অ্যাপারেটাস' হিসাবে ব্যবহারের কারণে *লালসালু*কে খুব সহজেই রাষ্ট্রটির নেতিবাচক ভাবমূর্তির সাথে মেলানো সম্ভব হয়েছে।

তবে সাধারণভাবে *লালসালু* আর বিশেষভাবে জমিলায় লিপ্ততার যত নমুনা মেলে, নিবিষ্টতার ছাপ তার তুলনায় খুবই কম। সম্ভাব্য অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে এখানে একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক:

> আমরা গভীর বিস্ময়ে লক্ষ করি যে যাপিত ধর্মাচারের তলায় লুকোনো ধর্মখোলসের অন্তরালে সাধারণ ও আবিল দেহধারী মানুষের আদিম নগ্ন চেহারা বারংবার তাঁর [ওয়ালীউল্লাহ্‌র] রচনায় ফুটে ওঠে। মজিদ, কাদের ও 'বহিপীরে'র পীরসাহেব যে-সরল সম্পর্করেখা নির্মাণ করে তার সমান্তরালে প্রতিস্থাপিত হয়ে যায় জমিলা, শিক্ষক আরেফ আলী ও তাহেরা। (হায়াৎ ২০১৬: ভূমিকা)

এ বিবরণে ওয়ালীউল্লাহ্-পাঠের প্রভাবশালী দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রতিফলন আছে। পাঠের এ ধরন প্রভাবশালী হলেও তাতে একদেশদর্শিতা এবং অতি সাধারণীকরণের ঝোঁক খুবই প্রবল। কাদের চরিত্র হিসাবে কোনো অর্থেই মজিদের সাথে তুলনীয় নয়। *চাঁদের অমাবস্যায়* সে এমনকি ধর্মবোধ বা ধর্মভিত্তিক ভাবাদর্শেরও প্রতিভূ নয়, যে অর্থে স্কুলের মৌলবি বা দাদাসাহেবকে টেক্সটের অনুমোদিত প্রতিনিধি বলা যায়। কাদের নিজে ধর্মের দোহাই ব্যবহার করেনি। শুধু পারিবারিক সম্মান-রক্ষায় উদ্‌গ্রীব বড় ভাইয়ের শনাক্তির উপর ভিত্তি করে চরিত্রটিকে মজিদের সমান্তরালে স্থাপন করা মোটেই সঙ্গত নয়। *বহিপীরে*র পিরসাহেবকে একই কাতারে এনে ফেলা আরো বিপজ্জনক। পিরালির যে কাজ করতে হয়, পির নিজে তা পছন্দ করে না—তার নিজের জবানে এ স্বীকৃতি এবং নাটকে তার সত্যতা বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও চরিত্রটির জটিলতা তালাশ না করে সরল খোপে প্রতিস্থাপন প্রমাণ করে, টেক্সটের সমর্থন নয়, বরং সমাজ-প্রচলিত সুবিধাজনক বর্গের আরোপণই এ ধরনের পাঠের মূল ভিত্তি।

আমাদের বর্তমান অনুসন্ধানের জন্য অবশ্য পরের তালিকাটিই অধিকতর জরুরি, যেখানে জমিলাকে আরেফ আলী ও তাহেরার সমান্তরালে স্থাপন করা হয়েছে। তাহেরার প্রায়-অবিকশিত চরিত্রে সচেতন-সক্রিয়তার আভাস আছে, আর এ দিক থেকে আরেফ আলীর সাথে তার মাত্রাগত না হোক, গুণগত বিচারে ক্ষীণ সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়তো সম্ভব, যদিও আরেফ আলীর যুক্তি ও বুদ্ধি-নির্ভর দার্শনিক অভিপ্রায় ও অভিযানের সাথে আসলে তাহেরার কোনো তুলনাই চলে না; কিন্তু এ তালিকায় একই অর্থে জমিলার ঠাঁই হওয়া পাঠ-মনস্তত্ত্বের এক সুদূরপ্রসারী প্রবণতার প্রমাণ বহন করে।

স্পষ্টতই, জমিলাকে এখানে আলোকবর্তিকা হিসাবে এক অন্ধকারের বিপরীতে সংগ্রামরত চরিত্র হিসাবে দেখা হয়েছে—এবং এভাবে দেখাটাই ওয়ালীউল্লাহ্-পাঠের প্রভাবশালী রেওয়াজ।

বর্তমান রচনায় আমাদের প্রধান দাবি, জমিলাকে এভাবে অ্যাকটিভ এজেন্সি বা সক্রিয় কর্তাসত্তা হিসাবে দেখানোতে টেক্সটের কোনো সমর্থন নাই। বিকট ভিলেনের বিপরীতে সক্রিয়তার কর্তা হিসাবে উপস্থাপনের মধ্যে একটা নগদ মুনাফার ইশারা আছে। কিন্তু এ ধরনের পাঠ উপন্যাসের গভীরতর নান্দনিকতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করে। শুধু তাই নয়, নিষ্ক্রিয় জমিলার মধ্যে বৃহত্তর অর্থে প্রতীকী-রূপকী তাৎপর্যের যেসব সম্ভাবনা দৃশ্যমান, নগদ লাভের আরোপণমূলক হিসাব বরং সে সম্ভাবনাকেই সীমিত করে দেয়।

২.১

লালসালু পাঠের কতগুলো সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি জমিলা-পাঠের নির্ধারক-নির্ণায়ক হিসাবে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে ভূমিকা রেখেছে। এর মধ্যে নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলা যায় উপন্যাসটিকে বাস্তববাদী অবস্থান থেকে পাঠ করা, এবং সেদিক থেকে সামগ্রিক বাস্তবতার অনুসন্ধান।

আবু জাফর (১৯৮৯) *লালসালু* পড়েছেন নির্ভেজাল বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। সামাজিক পটভূমির সাথে রাজনৈতিক পটভূমিতেও তিনি সে বাস্তবকে সম্প্রসারিত করেছেন। তবে বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মুসলমান সমাজের বাইরে অন্য যে-কোনো ধর্মাশ্রয়ী সমাজের ক্ষেত্রেও যে এ ধরনের প্রবণতা প্রায় হুবহু প্রযোজ্য হবে, যার পরিচয় বাঙালি হিন্দু লেখক-শিল্পীরা অসংখ্য শিল্পকর্মে তুলে এনেছেন, তার কোনো ইশারা তিনি দেননি। বলা যায়, তিনি লক্ষণাধর্মী পাঠেই গেছেন, তবে তার বিস্তার কেবল বাঙালি মুসলমান সমাজেই সীমিত রেখেছেন।

জমিলাকে এ লেখায় দেখা হয়েছে এক সফল প্রতিবাদী চরিত্র হিসাবে, যে মজিদের কুকীর্তির বিরুদ্ধে 'রুখে' দাঁড়ায় (১৯৮৯: ১৮)। এক সক্রিয় বিপ্লবের অংশ হিসাবেই, লেখকের মতে, জমিলা 'মজিদের মাজারকেন্দ্রিক সমস্ত আয়োজনকে দারুণ সংশয় ও অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে থাকে। সে তার প্রাণধর্মের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদেই মাজারের পেছনের ফাঁকিটুকু সহজেই আবিষ্কার করে। ... মজিদ যে ভণ্ড সেটাও বুঝতে পারে—সেই কারণে জমিলা মজিদকে মোটেই সহ্য

করতে পারে না' (১৯৮৯: ১৯)। মাজারের গায়ে জমিলার মেহেদি-রঙা পায়ের অবস্থান সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য (১৯৮৯: ২০): 'একি অচেতন হবার পূর্ব মুহূর্তে কল্পিত মোদাচ্ছের পীরের প্রতি জমিলার অশ্রদ্ধা প্রদর্শনেরই সচেতন প্রয়াস? হয় তো তাই।'

বশীর আলহেলাল (১৯৮৯: ৩৩) মনে করেন, *লালসালু*ই ওয়ালীউল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ উপন্যাস; তার প্রধান কারণ, 'বাংলার জীবন ও সমাজ, তার মানুষের পরিচয় 'লালসালু' উপন্যাসে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ও সুন্দরভাবে রূপলাভ করেছে।' উপন্যাসের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক (১৯৮৯: ৩৭) লিখেছেন, 'কাহিনীটি এককেন্দ্রিক। গ্রামের সাধারণ মানুষগুলির আবির্ভাব বিশেষ দেখা যায় না।' স্পষ্টতই উপন্যাসটিকে সমাজচিত্র হিসাবে দেখতে চাওয়াই এ সমালোচনার উৎস। তাঁর (১৯৮৯: ৩৬) বিবেচনায়, '*লালসালু* মানুষের অজ্ঞতা, মূর্খতা আর কুসংস্কারের বুকচাপা অন্ধ ভয়ের প্রতীকের কাজ করে, আর জমিলা সেই অন্ধকার-বিরোধী উজ্জ্বল মুক্ত জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে।'

সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০১৫: ২১২) লক্ষ করেছেন, *লালসালু* হয়ে উঠেছে 'কাহিনী অতিক্রম করে এক প্রতীকী উপন্যাস।' তাঁর মতে, মাজারটি 'বাঙালি মুসলমানের নিস্তরঙ্গ, নিশ্চেতন ও অনড় সমাজেরই প্রতীক।' তিনি উপন্যাসটি পড়েছেন এক শিকারের গল্প হিসাবে: 'শিকারী বকধার্মিক মজিদ আর শিকার ধর্মবিশ্বাসে অনড় এই নিস্তরঙ্গ বাঙালি মুসলমান সমাজ।' তবে প্রতীকের কথা বললেও লেখক সামাজিক-বাস্তববাদী উপন্যাস হিসাবেই একে দেখেছেন। বা বলা যায়, নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে এ দুয়ের কোনো ফারাক দেখেননি। অন্যত্র তিনি (২০১৫: ২৫৬) একে সাব্যস্ত করেছেন 'অত্যন্ত বাস্তববাদী উপন্যাস' হিসাবে। কারণ, '*লালসালু*র কহিনীটি উপরে উপরে এমনি একটি ভুঁইফোড় মাজার-কেন্দ্রিক গল্প কিন্তু ভিতরে-ভিতরে গ্রামের বাঙালি মুসলমান সমাজজীবনের আলেখ্য' (২০১৫: ২০৪)। স্বভাবতই তিনি (২০১৫: ২১২) উপন্যাসের সমাপ্তি এবং জমিলার ভূমিকারও এক প্রকার প্রতীকী তাৎপর্য শনাক্ত করেছেন: 'উপন্যাসের সমাপ্তিও প্রতীকী। জমিলা এখানে বিদ্রোহিনীর প্রতীক। তবে তার বিদ্রোহ নীরব ও নিঃশব্দ।' সৈয়দ আবুল মকসুদ এখানে জমিলা চরিত্রের নীরবতা ও নৈঃশব্দ্যেকে গুরুত্ব দিয়েছেন; কিন্তু মন্তব্যের বাইরে এ প্রতীকী বৈশিষ্ট্যের কোনো বিশ্লেষণাত্মক মাত্রা যুক্ত করতে পারেননি।

জীনাত ইমতিয়াজ আলী (২০১৫: ৯৪) যথার্থই বলেছেন, *লালসালু*র দ্বিতীয় সংস্করণ সাদরে গৃহীত হলেও, এবং পূর্ববাংলার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত হলেও, সমালোচকবৃন্দ একে মূলত 'সমাজচিত্র' এবং 'অবক্ষয়িত সমাজের আলেখ্য হিসেবে'ই বরণ করেছিলেন। তাঁর মতে, এ বিবেচনা 'নিতান্তই উপরি-স্তরের'। কিন্তু এর বিপরীতে তিনি নিজে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাও খুব আলাদা কিছু নয়। তাঁর মতে, 'সামগ্রিক জীবন-প্যাটার্নের আলোকে' উপলব্ধ মজিদ 'বিশেষ আর্থ-সামাজিক কাঠামো-সৃষ্ট নির্বিশেষ মানুষেরই' প্রতিনিধি।

মজিদ নির্বিশেষ মানুষের প্রতিনিধি কি না, সে প্রশ্ন এখানে খুবই জরুরি; কিন্তু আমাদের জন্য জরুরি সংবাদ হলো, একমাত্র 'বাস্তববাদী' দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করলেই কোনো উপন্যাস বা চরিত্র সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে।

দ্বিতীয় যে প্রবণতা *লালসালু* এবং জমিলার পাঠকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তা হলো, 'ইসলাম ধর্মে'র ধারণার সাথে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাস্তবতাকে মিলিয়ে পাঠ করা। পূর্বোক্ত বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এ প্রবণতার মধ্যেও পুরোপুরি ক্রিয়াশীল থেকেছে।

আবু জাফর (১৯৮৯: ১২) আসন্ন বা হয়ে-যাওয়া (১৯৪৭ সালে লেখা শুরু হলেও বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৯ সালে) পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপক হিসাবে উপন্যাসটি পড়েছেন, এবং একে সাব্যস্ত করেছেন উপন্যাসের 'নিগূঢ় অর্থ' হিসাবে। লিখেছেন, 'পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের যথেচ্ছাচারী ডিক্টেটরদের মতোই ছিল মজিদের কার্যকলাপের ভঙ্গি।'

শান্তনু কায়সার (২০১৪) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র তিনটি উপন্যাস পাঠ করেছেন পাকিস্তান আন্দোলন ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তিতে—*লালসালুর* বিভিন্ন অংশের সাথে তিনি উৎকটভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মিল দেখিয়েছেন। মিলের উৎস যতই 'অযৌক্তিক' হোক, এ ধরনের পাঠ নিশ্চয়ই সম্ভব; কিন্তু নিঃসন্দেহে সার্বিকভাবে বাস্তববাদী আবহই কেবল এ ধরনের পাঠের বৈধতা দিতে পারে। *লালসালুর* ক্ষেত্রে মজিদ ওই বাস্তবের সামগ্রিক অন্ধকারের প্রকাশ; কাজেই জমিলা হয়েছে প্রতিবাদের প্রতিভূ। তাঁর (২০১৪: ৬০) মতে, জমিলাকে বাগে আনা বা জব্দ করা 'সহজ নয় কিংবা প্রকৃতই অসম্ভব। কারণ হচ্ছে জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও প্রতিবাদ। ভুল বা তৈরি করা নৈতিকতা কখনো তাকে পরাস্ত করতে পারে না।'

এ অংশে অসতর্ক শব্দচয়ন ও আরোপণ খুবই ব্যাপক। তবে 'জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া' কথাটার মধ্যে জমিলার সামগ্রিক প্রকাশের গভীরতম সত্যটি আছে, যদিও এ লেখক 'প্রতিবাদ' শব্দের মধ্যে ওই সত্যের বিকাশ আটকে দিয়েছেন, এবং সহজেই অন্যদের মিছিলে শামিল হয়েছেন। 'ভুল বা তৈরি করা নৈতিকতা' *লালসালুর* ক্ষেত্রে আদতে কোনগুলো, সে কথাটাও পরিষ্কার নয়; কারণ, মজিদ আসলে প্রচলিত নৈতিকতার খুব সামান্যই ব্যত্যয় ঘটিয়েছে।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (২০১৪: ৮৭-৮৮) *লালসালু* পড়েছেন 'ধর্মের ভিত্তিতে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত' পাকিস্তান রাষ্ট্রের 'রাষ্ট্রীয় সংহতির নিয়ামক ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংকেতিত প্রতিবাদ' হিসাবে। তাঁর মতে, গ্রন্থটি 'নিশ্চিতভাবে অনতিদূর ভবিষ্যৎ-দর্শনও' বটে।

২.২

উপরে আমরা *লালসালু*-পাঠের কিছু প্রধান প্রবণতা ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলাম। তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়; তবে এ থেকে প্রতিনিধিত্বশীল পাঠের হদিস পাওয়া যায়। মুখ্যত উপন্যাস-পাঠের খতিয়ান হলেও জমিলা সম্পর্কে প্রতিনিধিত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গির আভাসও এগুলোতে আছে; কারণ, উপন্যাসটি কীভাবে পঠিত হচ্ছে তার নিরিখে চিহ্নিত হয়েছে মজিদ, আর জমিলার পাঠ স্বভাবতই মজিদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই আমূল নিয়ন্ত্রিত।

সামাজিক সত্য হিসাবে যারা উপন্যাসটি পড়েছেন, তারা একটি অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, ধর্ম ও কুসংস্কার-শাসিত এবং উত্থানশক্তিহীন গ্রামীণ বাস্তবতাই আবিষ্কার করেছেন। মজিদ সেখানে

আবির্ভূত হয়ে বিদ্যমান অচলাবস্থাকে হয় আরো ঘনীভূত করেছে, নয়তো আমদানি করেছে নতুন অচলায়তন। যারা ধর্ম ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্রে রেখেছেন, তাদের পাঠে ধর্মীয় কুসংস্কার প্রাধান্য পেয়েছে, সাথে যুক্ত হয়েছে ধর্মের নামে বা ধর্মের দোহাই দিয়ে আরোপণমূলক মতাদর্শের নিপীড়ন, যার সাথে তাঁরা অনুরূপ রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন। দু-ক্ষেত্রেই মজিদ এক নিকষকালো অন্ধকার হিসাবে চিহ্নিত-চিত্রিত হয়েছে।

অন্ধকারের বিপরীতে চাই আলো; নিপীড়নের জবাবে প্রতিবাদ। *লালসালু*র পঠনে জমিলা বিবেচিত হয়েছে আলো এবং প্রতিবাদের চূড়ান্ত প্রকাশ হিসাবে। পাঠগুলোতে অন্ধকার যত ঘনীভূত হয়েছে, প্রতিবাদী জমিলাও তত উজ্জ্বল হয়েছে।

'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যমণি অচেনা মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে আকস্মিক অনুপ্রবেশ, ধর্মীয় নানা কুসংস্কারকে সামনে রেখে সেই গ্রামের নিরীহ-নিরক্ষর অধিবাসীদেরকে শাসন ও শোষণ এবং প্রতি পদক্ষেপে ক্ষমতাদর্পী সম্রাটের মতো তার আচরণ ও কথোপকথন—এর সব কিছুই ইসলামী তাহজীব ও তমুদ্দুনে সমৃদ্ধ তৎকালীন পাকিস্তানের দর্পিত রাষ্ট্রনায়কদের পূর্ববঙ্গে অনুপ্রবেশ ও ধর্মের নামে শাসন-শোষণের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় না কি?'—এ প্রশ্ন রেখে আবু জাফর (১৯৮৯: ২৬-২৭) জমিলাকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে: 'ধর্মের ঢক্কা নিনাদ শুনে অনেকেই সম্মোহিত হয়েছে ... কিন্তু তার মধ্যেই জমিলাদের মতো শক্তিও পাক সরকারের (মজিদের গড়া মাজারের মতো) ধর্মের অচলায়তন ভেঙ্গে ফেলার জন্য তীব্র রোষে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।' আবু জাফরের এ দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত 'বিদ্রোহী' জমিলার অন্যতম সারকথা।

সনৎকুমার সাহা (২০১৪: ১৮) মজিদের মুখে জমিলার থুথু নিক্ষেপকে বলেছেন 'শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রত্যাখ্যান। মজিদের জান্তব লালসায় নির্মিত শিকড়হীন উপাসনাবৃক্ষের কদর্য বাস্তবতাকেই প্রত্যাখ্যান।' প্রত্যাখ্যানটা কি জমিলা করল, নাকি এ ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলো, অর্থাৎ পাঠকের দিক থেকে—লেখকের দিক থেকে তো বটেই—পাঠ-তাৎপর্যসূত্রে প্রত্যাখ্যান বলে প্রতীয়মান হলো, এ জরুরি প্রশ্ন তাঁর বা অন্য অধিকাংশ সমালোচকের মনে আসেনি।

অর্থাৎ জমিলাকে ঘৃণায় ও প্রতিবাদে সক্রিয় হিসাবে দেখানোর জন্য সমালোচকদের অধিকাংশই টেক্সটের সমর্থন খুব একটা গ্রহণ করেননি। রফিক কায়সার (২০১৪: ৭৮) ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে চিত্রিত নর-নারীর সম্পর্ক প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'লালসালুর নায়ক মজিদকে তার প্রথম স্ত্রী ভয় করে, দ্বিতীয় স্ত্রী সমভাবে করে ঘৃণা ও উপেক্ষা।' জমিলার দিক থেকে দুটোই পরম সক্রিয়তার দ্যোতক, যার কোনোটিরই বিন্দুমাত্র আভাস উপন্যাসে নেই। লেখক ধরেই নিয়েছেন, এত এত ঘটনার পরে 'ঘৃণা ও উপেক্ষা'র মতো শব্দে এ সম্পর্কের প্রকাশ হতেই পারে।

জমিলার সক্রিয়তা ও বিদ্রোহী সত্তা *লালসালু*র পাঠে এতই সর্বব্যাপ্ত যে, যারা উপন্যাসটি ভিন্নভাবে পড়েছেন, তাদের ক্ষেত্রেও এর বিশেষ হেরফের হয়নি। উদাহরণ হিসাবে সৈয়দ আকরম হোসেনের (১৯৯৭) উল্লেখ করা যায়। *লালসালু*-পাঠে সৈয়দ আকরম হোসেন

বিরলদের একজন, যারা মজিদকে 'ধর্মাশ্রয়ী প্রতারক' পরিচয়ে সীমিত করে ফেলেননি। তিনি (১৯৯৭: ৮৪) মজিদকে দেখেছেন মুখ্যত 'অস্তিত্ববাদী' চরিত্র হিসাবে, আর একই ধারাবাহিকতায় আত্মস্বার্থমগ্ন ও পরস্বার্থ-সংহারক মজিদ বিবেচিত হয়েছে 'অশুদ্ধ সত্তা' অভিধায়। স্বভাবতই মজিদের বিপরীতে সক্রিয় চরিত্রগুলোর মধ্যে তিনি তালাশ করেছেন 'শুদ্ধ সত্তা'। 'এরই অব্যাখ্যাত অথচ সংতেকময় তরঙ্গ-বলয়বিন্দু হলো জমিলা, মজিদের স্ত্রী।'

'সমাজচিত্র' হিসাবে না পড়লেও এবং *লালসালুর* সাঙ্কেতিকতা-মণ্ডিত প্রগাঢ় ভাষার তাৎপর্যে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিলেও জমিলার 'সক্রিয়তা'র ব্যাপারে সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৯৭: ৯১-৯২) যে অন্যদের সাথে একমত, তার স্পষ্টতর প্রমাণ মেলে 'ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস: দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যা' প্রবন্ধে। এখানে তাঁর বিবরণে মজিদ 'অন্ধকারের অধীশ্বর'ই বটে, তবে লেখকের অন্যতর অভীপ্সার কারণে, এ প্রাবন্ধিকের বিবেচনায়, উপন্যাসটির রসনিষ্পত্তি ভিন্নভাবে হয়েছে। 'অন্তিমে জমিলার মেহেদিরঞ্জিত প্রতীকী পদাঘাত আমাদের পৌঁছে দেয় সুস্থিত প্রশান্ত এক সত্যদর্শী অস্তিত্ববলয়ে।' আর এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই, তাঁর মতে, 'উপন্যাসের অন্ত্য-পর্যায়ে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করলেন জমিলার প্রেক্ষণবিন্দু'।

কোনো সন্দেহ নাই, উপন্যাসটিকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পাঠ করার অভিপ্রায় থেকেই তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 'পদাঘাত' কথাটি সক্রিয়তার দ্যোতক। প্রেক্ষণবিন্দুও বস্তুত এক গভীরতর ও কার্যকর সক্রিয়তা—ভাবনা-বিবেচনা-মূল্যায়নের নিজস্বতা। জমিলার মধ্যে এ ধরনের কোনো উদ্যম তো লক্ষ করা যায়ইনি, বরং বলা দরকার, উপন্যাসে জমিলার নিজের পরিস্থিতিও আসলে নিরঙ্কুশভাবে পাঠকের জন্য লেখকের বর্ণনা। 'শুদ্ধ সত্তা'র কোনো ইশারা যদি এ উপন্যাসে থেকেই থাকে, তাহলে তা কেবল সম্ভাবনা আকারে আছে, কোনো প্রায়োগিক ও বাস্তবিক মূল্য তার নেই; কারণ, এ ধরনের কোনো অস্তিত্বে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় কোনো প্রকার সক্রিয়তা এ কাহিনির 'শুদ্ধতা'র অভিসারী একটি চরিত্রেরও নাই—জমিলার এমনকি কোনো আকাঙ্ক্ষাও নাই, যা অন্য চরিত্রগুলোর আছে।

রফিক কায়সার (২০১৪: ৭৯)—কতটা সচেতনভাবে বলা মুশকিল, কারণ একটুও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নাই—চকিতে জমিলার পাঠ প্রসঙ্গে এক মন্তব্য করেছেন, যেখানে আমাদের বিবেচনা-মোতাবেক, এক গভীর সত্য ধরা পড়েছে। তিনি লিখেছেন, উপন্যাসে কপটতা, নিষ্ঠুরতা ও চাতুর্যের মধ্য দিয়ে মজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক ধূর্ত ধর্মব্যবসায়ী হিসাবে। 'ফলে পীরবাদের বিরুদ্ধে আপনা আপনি তৈরি হয় ভিন্ন এক বয়ান। যে বয়ানে জমিলার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি পায়।'

পিরবাদের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া সমালোচনাধর্মী বয়ানের জন্য জমিলার 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' প্রতিষ্ঠা যে খুবই জরুরি, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। মুশকিল হলো, পিরবাদের বয়ান এবং জমিলার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—দুটোর কোনোটিই টেক্সটের আয়োজন ও অভীপ্সাকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়নি।

স্পষ্টতই সাধারণভাবে *লালসালু* ও বিশেষভাবে জমিলার পাঠগুলো সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে মতাদর্শ-তাড়িত ধারণা দ্বারা শুধু প্রভাবিত নয়,

নিয়ন্ত্রিতও বটে। সমাজ অধ্যয়নের জন্য এ ধরনের পাঠের রীতিমতো গভীর গুরুত্ব আছে। কিন্তু কোনো ডিসিপ্লিনের যে অংশ ডিসিপ্লিনের সীমানা পেরিয়ে সাধারণ সামাজিক কাণ্ডজ্ঞানের আওতায় কাজ করে, এ ধরনের পাঠ তারই অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যপাঠের জন্য টেক্সট-নির্ভরতা এবং সাহিত্যের ডিসিপ্লিনারি যে কুশলতার দরকার হয়, যা ন্যূনতম মাত্রায় বজায় না থাকলে ওই পাঠ অন্য যাই হোক, সাহিত্যপাঠ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না, *লালসালু*র অধিকাংশ পাঠ আসলে তার গোত্রভুক্ত।

উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণ ব্যর্থ হওয়ার কারণ সম্পর্কে সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০১৫: ২০৩) অনুমান করেছেন, পাকিস্তান আন্দোলন ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের তাজা অনুভূতির মধ্যে বইটি হয়তো আবেগগত কারণে গৃহীত হয়নি। সেদিক থেকে, ১৯৬০-এর দশকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রশংসিত ও জনপ্রিয় হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা যায়, তখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আবেগের ওই বাড়াবাড়ি ছিল না। কিন্তু এ ধরনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিচারে একদেশদর্শী ও অতিমাত্রায় সারল্যদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। যারা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে পুরস্কৃত করেছিলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি ১৯৬১ সালে তাদের পক্ষপাত না থাকার কোনো কারণ ছিল না। ষাটের দশকে স্নাতক পর্যায়ে বইটি পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করাও (সৈয়দ আবুল ২০১৫: ২০৩) নিশ্চয়ই পাকিস্তান রাষ্ট্র-বিরোধী কোনো উদ্যোগ হিসাবে গৃহীত হয়নি। বস্তুত *লালসালু* ষাটের দশকে কোনো পাকিস্তান-বিরোধী কেতাব নয়, পঠিত হয়েছে পশ্চাৎপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসাবে, আর এর পেছনে ওই জনগোষ্ঠীর আধুনিকায়নের আকাঙ্ক্ষাই মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল। ষাটের দশকের পাকিস্তানপন্থি কোনো বুদ্ধিজীবীই আধুনিকায়নের এ আকাঙ্ক্ষার বিরোধী ছিলেন বলে প্রমাণ মেলে না।

আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য জরুরি তথ্য হলো, ষাটের দশকে যেখানে বইটি পঠিত হয়েছিল প্রধানত ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশ হিসাবে, সেখানে আশি-নব্বইয়ের দশকের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে প্রধান প্রবণতা দাঁড়ায় 'ধর্ম-বিরোধী' ও 'পাকিস্তান রাষ্ট্র-বিরোধী' টেক্সট হিসাবে পাঠ। দু-ক্ষেত্রেই বাস্তববাদী পাঠই—মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া—প্রায় নিরঙ্কুশ প্রাধান্য পেয়েছে; আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জমিলার উজ্জ্বল সক্রিয়তা ও প্রতিবাদী সাফল্য।

৩

হাসান আজিজুল হক (২০১৪: ১৪৮) *লালসালু* প্রসঙ্গে নিজের বদলে-যাওয়া উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছেন এভাবে: এক. 'সচরাচর সামাজিক উপন্যাস বলতে যা বোঝায় *লালসালু* মোটেই তেমন নয়।' দুই. *লালসালু* 'শেষ দুটি উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, একজন বদলে-যাওয়া লেখকের প্রথম দিকের লেখা নয়, উৎস একই।'

উপরে জমিলা-পাঠের সূত্র খুঁজতে গিয়ে *লালসালু*-পাঠের প্রধান যেসব প্রবণতা চিহ্নিত করা হয়েছে, হাসান আজিজুল হকের মন্তব্য তার একেবারেই বিপরীত। তিনি অবশ্য নান্দনিক দিক থেকে নিজের কথাটা বিশদ করেননি; কিন্তু তাঁর মন্তব্যে *লালসালু* সম্পর্কে এ যাবত অনুচ্চারিত দুটি সত্যের উন্মোচন ঘটেছে বলেই ধারণা করি। আমরা এখন জমিলাকে চিহ্নিত

করার স্বার্থে *লালসালু* উপন্যাসের নন্দন-সূত্র এবং মজিদের চরিত্রায়ণ-কৌশল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

৩.১

লালসালুর বাস্তব সূক্ষ্ম ও মর্মস্পর্শী। উপাদান এবং উপাদানের সমন্বয়ে গড়া কাঠামো এখানে বর্ণিত হয়েছে বস্তুর ধর্মকে পুরোপুরি মান্য করে। এমনকি মনের চেহারাও ব্যতিক্রমহীনভাবে আবির্ভূত হয়েছে রঙ আর রেখার সমবায়ে গড়া আকারের বেশে। ভাষার আলংকারিকতা মূর্ততার মাত্রা আর বস্তুগুণের প্রতি নিষ্ঠায় চিড় ধরাতে পারেনি। উৎপাদন, বণ্টন, উৎপাদন-সম্পর্ক তথা মানব-সম্পর্কের ব্যাপারে জোরদার হুঁশিয়ারি না থাকলেও স্বাভাবিকতা খুব একটা লঙ্ঘিত হয় নাই। তারপরেও এ টেক্সটকে নির্জলা বাস্তববাদের নিরিখে পাঠ করার অসুবিধা আছে। জীবনযাপনের কাঠামোগত বাস্তবের খুব স্বাভাবিক ও সহজাত বহু উপাদান এখানে সম্পূর্ণ গরহাজির। যেমন, মহব্বতনগর গ্রামে পড়াশোনার বন্দোবস্ত সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। খালেক ব্যাপারি এবং আমেনার মনের ব্যাকরণের যে পরিচয় পাই, তাতে শুধু ধর্মবোধই যে প্রবল তা নয়, ন্যায় ও নৈতিকতার সুরুচিও খুব স্পষ্ট। অথচ, এ পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল দূরের কথা, একটা পাঠশালা বা মক্তবও নাই—বাংলাদেশের ইতিহাসের কোনো পর্বের জন্যই এটা বাস্তবসম্মত নয়। দূরের গ্রামে হাসপাতাল বা ইউনিয়ন বোর্ডের কথা আছে। কিন্তু মহব্বতনগর গ্রামে ওইসব ক্ষমতা-কাঠামো ঠিক কী ভঙ্গিতে ক্রিয়াশীল, তার কোনো হদিস উপন্যাসটিতে পাওয়া যায় না।

ধর্ম অ-নাগরিক যে-কোনো সমাজ-বাস্তবের সবচেয়ে জরুরি সংগঠন; অথচ মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের আগমনের আগে এর রূপ কী ছিল, তার পরিচয় প্রদানে লেখক স্পষ্টতই ইচ্ছাকৃত গাফিলতি করেছেন। গ্রামে নামাজ-রোজার চর্চার বিস্তর উল্লেখ আছে, অথচ ধর্মশিক্ষার বন্দোবস্ত বা উপাসনালয় নাই—তা সে আকারে-প্রকারে যেমনই হোক, এ অবস্থা দুনিয়ার কোনো সমাজেই অন্তত ঐতিহাসিক কালপর্বে ছিল না। মজিদ আশ্রয় নিয়েছে পিরতন্ত্রের; কিন্তু তার আচরণ বাইরে তো বটেই, স্বগতোক্তিতেও মুখ্যত শরিয়তির। মজিদ, যে-কোনো রূপেই হোক না কেন, স্থানীয় ধর্ম-কাঠামোয় বিদ্যমান ক্ষমতাতন্ত্রের মুখোমুখি হওয়ার কথা। সে ক্ষমতাতন্ত্র দুর্বলতার কারণে হয়তো ভেসে যেত তৃণখণ্ডের মতো; কিন্তু সমাজ যেখানে আছে, সেখানে এ ধরনের কিছু না থাকা অসম্ভব। সর্বোপরি, ধর্মচর্চার নানা ধরনের পরোক্ষ কিন্তু কখনো কখনো মোক্ষম সমালোচনা হাজির থাকলেও পুরো উপন্যাসে খোদ 'ধর্ম' বা 'ধর্মচর্চা'র প্রতিনিধিত্ব করার মতো একটা চরিত্র পরোক্ষেও হাজির হয়নি, যার সাথে মজিদের মোলাকাত বা মোকাবেলা হতে পারত।

বোঝা যায়, সমাজ বা জীবনের বাস্তব উপন্যাসটির শিল্পস্বভাব, লক্ষ্য নয়। স্পষ্টতই, চারপাশ থেকে বিযুক্ত করে, অথচ কেবল ভাবগত প্রয়োজনে বহিঃপৃথিবীর সংযোগ ঘটিয়ে, *লালসালু* মহব্বতনগর নামের এমন এক স্বতন্ত্র পরিসর তৈরি করতে চেয়েছে, যেখানে প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব।[১] এর অংশ হিসাবে তৈরি হয়েছে ভাবাদর্শের চাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এক জনসমাজ। মাটি ও ফসলে আমূল লিপ্ত এ জনগোষ্ঠী ধর্মকর্ম করে, কিন্তু তুলনামূলক

সহি-ধার্মিকতা প্রায় প্রাকৃতিকতায় নিমজ্জিত মানুষের উপর কোনো চাপ তৈরি করে না। ধর্মবিশ্বাস ও রীতি-রেওয়াজের কোনো স্থির-নির্দিষ্ট কাঠামো সেখানে নাই। সে কারণেই এ বাবদ ক্ষমতা-সম্পর্কের কোনো অসম পরিস্থিতিও তৈরি হয় না। ব্যাপারটা যে মোটেই কাকতালীয় নয়, বা লেখকের দিক থেকে 'ভুল' নয়, তার এক প্রমাণ এই যে, শ্রেণিজনিত কোনো অসম ক্ষমতা-সম্পর্ক টেক্সটটিতে কার্যকরভাবে একবারের জন্যও উচ্চকিত হয়নি। ধর্ম-কাঠামো এবং শ্রেণি-কাঠামোর কার্যকর অনুপস্থিতি যে-কোনো বাস্তববাদী আয়োজনে দুরপনেয় ত্রুটি। শিল্পের বাজারে এ অবস্থা কেবল তখনই গ্রাহ্য হতে পারে, যখন অন্যতর কোনো নিরীক্ষার জন্য আয়োজনটি সম্পন্ন হয়। *লালসালু*তে ঘটনাটা ঘটেছে প্রায় এক 'আইডিয়াল' পরিসরে 'বহিরাগত' মজিদকে প্রবেশ করতে দিয়ে। মজিদ যে বিশ্বাস-কাঠামো ও আচার-কাঠামো সাথে নিয়ে এসেছে, তাও বহিরাগত। মজিদ যেমন, ঠিক তেমনি তার আনা ভাবাদর্শিক কাঠামোও মহব্বতনগরবাসীর আধা-চেনা আধা-অচেনা; এবং দুটিই এখানে কার্যকর হয়েছে আরোপণ ও নিপীড়নমূলকভাবে।

শিল্পতত্ত্বের দিক থেকে 'বাস্তবের গল্পে'র বিপরীতে এ অবস্থাকে বলা যায় 'গল্পের বাস্তব'।[২] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যে সাধারণভাবে বাস্তবের গল্প না লিখে গল্পের তথা থিমের অনুরোধে বাস্তব নির্মাণ করতেন, তাঁর অধিকাংশ গল্প এবং অন্য দুটি বাংলা উপন্যাস অবলম্বনে তা খুব সহজেই দেখানো যায়। তবে *লালসালু* উপন্যাসে অনুপুঙ্খের পরিমাণ এত বেশি, আর গ্রামীণ পরিসরের সামগ্রিক পরিচয় এতই নিপুণ যে একে 'বাস্তবের গল্প' বলেই ভ্রম হয়।[৩] আজতক এ উপন্যাসের সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠ এ নিরিখেই সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু যদি কেবল এই দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয় যে, উপন্যাসটি বস্তুত মজিদ ছাড়া আর একটি 'চরিত্র' নিয়েও বিশদভাবে লিপ্ত হয়নি, প্রতিটি চরিত্র আবির্ভূত হয়েছে চরিত্রের পূর্ণতা নিয়ে কেবল বিশেষ লক্ষ্য হাসিলের নিমিত্তে, আর সে কারণেই এর কাহিনি-রেখা অনেক বেশি স্কেচধর্মী, তা যতই পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তব ও মনোবিশ্লেষণের জাদুতে একে কাহিনিধর্মী মনে হোক না কেন—তাহলেই পূর্বোক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হবে। কথাটা আসলে উপন্যাসটির প্রায় সমস্ত উপাদানগত আয়োজনের ক্ষেত্রেই সত্য। স্রেফ হাসুনির মা ছাড়া কথাটা মজিদকে আর কেউ বলতে পারে না—তাহেরের বাপের এ বিশ্বাসকে ভিত্তি দিতে তার বাড়িটিকে অন্য লোকালয় থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে; কোনো পূর্বসূত্র ছাড়া আওয়ালপুরে পাঠানোর জন্য আমদানি করা হয়েছে বোকাসোকা ধলা মিঞাকে; ধলা মিঞার আওয়ালপুরে না-যাওয়ার কারণ হিসাবে আনা হয়েছে ভূতুড়ে গাছ; কোনো পারিবারিক পূর্বসূত্র ছাড়াই সোজা স্কুল-গড়ার উদ্যম নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে আক্কাস; এমনকি আওয়ালপুরের যে পির প্রায়ই আসে এ অঞ্চলে, আর মহব্বতনগর গ্রামেও যার এন্তার মুরিদ, মজিদের সাথে দ্বৈরথের প্রয়োজন দেখা দেওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা তার নাম-গন্ধও শুনতে পাই না, যদিও পিরালির সাধারণ সূত্র-অনুযায়ী এ ধরনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মহব্বতনগরে মজিদ আসার পর থেকেই অনুভূত হওয়ার কথা। এ তালিকা আসলে শেষ হওয়ার নয়। শুরুর আমসিপারা-দৃশ্যটিও এক প্রকল্পিত নির্মাণ—কোনো জনগোষ্ঠীর উৎপাদন-বণ্টন-ভোগের বাস্তব-পরিচয় এ রকম হতেই পারে না। এরপর শিকার-দৃশ্য থেকে শুরু করে শেষের শিলাবৃষ্টি পর্যন্ত কোনো 'ইভেন্ট'ই বাস্তববাদী

কাহিনির কার্যকারণের অনিবার্যতায় আবির্ভূত হয়নি, এসেছে মজিদ এবং তার ভাবাদর্শ উন্মোচনের অনুরোধে।

শিল্পকলা-পাঠের দিক থেকে কোনো টেক্সটের এ রকম বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রধান তাৎপর্য এই যে, 'বাস্তবের গল্প' যেখানে মুখ্যত মেটনিমিকেল বা লক্ষণাধর্মী পাঠের আমন্ত্রণ জানায়, 'গল্পের বাস্তব' সেখানে রূপকী-প্রতীকী পাঠের সম্ভাবনা অনেকাংশে বাড়িয়ে তোলে।

আমাদের প্রস্তাব, *লালসালুর* এ ধরনের পাঠই টেক্সটের অভ্যন্তর-চিহ্নের বিবেচনায় অধিকতর অভিপ্রেত; আর সেদিক থেকে জমিলার নিষ্ক্রিয় সক্রিয়তা উপন্যাসটির জন্য অপরিহার্য।

৩.২

লালসালুর মজিদ উপন্যাসের বাকি চরিত্রগুলো থেকে কেবল মতাদর্শ ও কার্যকারণেই আলাদা নয়, চরিত্র-নির্মাণের কারিগরিতেও খুবই স্বতন্ত্র।

প্রথম দু-পৃষ্ঠার বিবরণের সাথে মজিদের তামাম অস্তিত্বের আবশ্যিক যোগ; এ অংশ নিখুঁতভাবে তার বিদ্যা-বুদ্ধিসহ নিরেট শঠতার কার্যকারণ নির্দেশ করে। মজিদের স্বভাব ও তৎপরতার খানিকটা অ্যাসেন্সিয়ালিস্ট বা মর্মবাদী এই ব্যাখ্যা প্রকৃতিবাদীদের কথাই মনে করিয়ে দেয়—পারিপার্শ্বিক অবস্থাই যে ক্ষুধা ও যৌনতার মতো প্রধান প্রবৃত্তির প্রত্যক্ষ আশকারায় মানুষের অন্তর্নিহিত ও বহির্দেশীয় প্রবণতা নিপুণভাবে এঁকে দেয়, তা নির্দেশ করে, যদিও খালেক ব্যাপারি বা অন্য কারো ক্ষেত্রে *লালসালু* এ ব্যাকরণ মান্য করেনি, আর মজিদের ক্ষেত্রেও এ প্রবণতা তার কর্মকাণ্ডের সবটুকু ব্যাখ্যা করে না।

তাহের-কাদেরের মাছ-শিকারের অসামান্য বর্ণনা বস্তুত এক প্রতীকী তাৎপর্য অর্জন করে মজিদের ক্ষেত্রে। মজিদ যে আবির্ভূত হয় পাকা শিকারি হিসাবে, তার এক নিখাদ রূপকী বিবরণ হয়ে উঠতে চায় যেন। লক্ষণীয়, এই স্বভাবকে আমরা *লালসালুর* সাধারণ মানবধর্ম হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারি না, কারণ আর কোনো চরিত্রের মধ্যে এ স্বভাব পরীক্ষিত হয়নি।

তার মানেই হলো, পারিপার্শ্বিকের প্ররোচনায় জৈবপ্রবৃত্তির তত্ত্বাবধানে মজিদকে আবিষ্কারের যে উদ্যম, তা *লালসালুর* সাধারণ মানবধর্ম নয়। এ কথা স্বীকার করলে এও বলতে হয়, মজিদের প্রতারণাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্যই এ আয়োজন।

৩.৩

কিন্তু চরিত্রায়ণে আয়োজনের যতই ভিন্নতা থাকুক, মজিদ কাজ করেছে এজমালি ভাষা-কাঠামোর মধ্যেই—সে ভাষা-কাঠামোকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেই বেড়ে উঠেছে তার জৈব-অস্তিত্ব।

লালসালুর মজিদ-পূর্ব সমাজে মানুষ ধর্মকর্মসহই বিরাজমান ছিল। শিল্পবিপ্লব হয়নি এমন অঞ্চলে এর বাইরে কোনো সমাজ অসম্ভব। তবে, আগেই বলা হয়েছে, পরিসরটিকে আলাদা করে 'নিরপেক্ষ' করার প্রয়োজনে লেখক ধর্মীয় যে-কোনো কাঠামো বা ক্ষমতা-সম্পর্কের

কার্যকরতা মুলতবি রেখেছেন, যেন পুরো পরিসরটিকে 'প্রাকৃতিকতায়' বিমণ্ডিত এলাকা হিসাবে দেখানো চলে। মজিদ যে কাঠামো নিয়ে উপস্থিত হলো, তার প্রবলতা অতি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে পারার প্রয়োজনেই এটা করা হয়েছে। কিন্তু মজিদের কাঠামো আসলে কাজই করত না, যদি ধর্মনির্ভর ভাষার বিভিন্ন স্তরের সাথে এ জনগোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ পরিচয় না থাকত। ঠিক এ অর্থেই শিল্পকর্ম বাস্তবের অনুলিপি নয়, কিন্তু যাপিত বাস্তবের সাথে শৈল্পিক বাস্তবের সম্পর্ক পারস্পরিক।

মজিদের সাথে গ্রামবাসীর প্রথম মোলাকাতের কথাই ধরা যাক। মজিদ বলেছে, 'আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?'[৪] (পৃ. ৬)। এ মজলিসে গ্রামের সব ধরনের মানুষের প্রতিনিধিত্ব ছিল। তাদের সবার মাথা হেঁট হয়েছে। কেউ কোনো টুঁ শব্দ করেনি, প্রতিবাদ তো দূরের কথা। কোন পরিস্থিতিতে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে? যে ভাষা-কাঠামো মজিদ ব্যবহার করেছে, তাতে পূর্ণ সমর্থন না থাকলে, নিজেরা সে ভাষা-কাঠামোর অধীন না হলে, মজিদের কথা কি এমন নিঃসংশয় আধিপত্যে কাজ করতে পারত? ধরা যাক, কোনো অজ্ঞাত-কুলশীলের কবর নয়, একেবারেই পরিচিত একজন পির বা সাধারণ্যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাধিকারী কোনো ব্যক্তির কবর নিয়েই এ কারবার। গ্রামবাসীদের তরফে প্রতিক্রিয়ার বড় কোনো হেরফের হতো কি?

আক্কাসের সাথে মজিদের যে বিরোধের কথা চূড়ান্ত নিশ্চয়তার সাথে আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যে প্রচারিত হয়েছে, সেখানে খুব কমই মনে রাখা হয়েছে যে, এ বিরোধ বস্তুত তার বাবাসহ গ্রামবাসী তাবত লোকের সঙ্গেই—শুধু মজিদের সাথে নয়। মজিদ 'তোমার দাড়ি কই মিঞা?'-র মতো বেমওকা ও আচানক এক প্রসঙ্গের চালিয়াতি করে বটে, কিন্তু মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে অন্য কেউ ক্ষীণ স্বরেও উদ্যোগ নেয়নি। এমনকি আড়ালে-আবড়ালে বা স্বগতোক্তিতে সে ধরনের কোনো বাসনাও প্রকাশ করেনি। কাজেই আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগটিকে কেবল মজিদের বিপরীতে স্থাপন করে পাঠ করা এক পাঠ-অক্ষম অসহায়ত্বের লক্ষণ। নিদেনপক্ষে বলা উচিত, মজিদের অস্তিত্বভীতিতে সওয়ার হয়ে মহব্বতনগরবাসীর 'অন্ধকার' দীর্ঘায়িত হয়েছে, কিন্তু এর সূত্রপাত সে করেনি।

মজিদ কাজটি যে করতে পারে, তার কারণ বিদ্যমানতার উপর তার নির্মিত ও অর্জিত কর্তৃত্ব। সে রহিমাকে বলে, 'অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে।' এ কথাটাই সাধারণত উদ্ধৃত হয়। কিন্তু আসলে পরের বর্ণনাটাই অধিক তাৎপর্যপূর্ণ: 'এ-কথা আগেও শুনেছে রহিমা। মুরব্বিরা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়ারা বলেছে। মজিদের কথার বাইরে সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়' (পৃ. ৮)। বলা যায়, মোদাচ্ছের পিরের ছায়ার নিচে মজিদ পির-ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট একরাশ কর্তাসত্তার অধিকারী হয়েছে—সে অথরিটি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় তার পরিষ্কার কুশলতা আছে। শুধু জনমনস্ততত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ করা বা ক্ষমতা-সম্পর্কের কুশলী ছক তৈরি করায় নয়, ধর্মের আচারগত পরিবেশনায়ও সে দক্ষ। তার কোরান তেলাওয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'গলা ভাল তার, পড়বার ভঙ্গিও মধুর। একটা চমৎকার সুরে সারা বাড়ি ভরে যায়। যেন হাস্নাহানার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়' (পৃ. ৮)। লক্ষণীয়, এ বিবরণে কোনো প্রকার হাস্যরস বা শ্লেষ নাই।

নিখাদ প্রাকৃতিকতা আর প্রবৃত্তিতে মজিদও সম্পূর্ণ বশীভূত হয়। ধান সিদ্ধ করায় ব্যস্ত বেগুনি শাড়িপরা হাসুনির মাকে দেখে মজিদ প্রবৃত্তির শাসনের বশ্যতা মানে। এ ব্যাপারে *লালসালুর* আয়োজনটা হয়েছে দারুণ জুতসই। বলা হয়েছে, 'মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে' (পৃ. ২২)। আর শেষে সে যখন ডেকে নেয় রহিমাকে, তখন 'রহিমার দেহভরা ধানের গন্ধ। যেন জমি, ফসল ধরেছে। ... মজিদ ... ধানের গন্ধ শোঁকে। শীতের রাতে ভারি হয়ে নাকে লাগে সে-গন্ধ!'

দেখা যাচ্ছে, দৈহিক পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া আর ফসলের উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সাথে মজিদেরও জৈব-সম্পর্কই বটে। তবে এই প্রাকৃতিকতায় মানুষের সামাজিক-সামষ্টিক জীবনের কথকতা সম্পূর্ণ হয় না। তার দরকার হয় সংস্কৃতি। প্রশ্ন হলো, ওই সংস্কৃতি প্রাকৃতিকতার দাবি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করছে কি না, বা প্রাকৃতিকতাকে নিপীড়নমূলক সম্পর্কে বন্দি করছে কি না। মজিদ দুটোই করেছে। কিন্তু করেছে সামাজিক ভাষার দাবি মেনে নিয়ে। নিজের খায়েশ চরিতার্থ করার জন্য সে কেবল ওই অংশটুকুই বাস্তবায়ন করতে পেরেছে, যে অংশ সামাজিক সম্মতির ভিত্তিতে করা সম্ভব। হাসুনির মায়ের দেহের 'উজ্জ্বল লালিত্য' তার মনে আকাঙ্ক্ষার যে বীজ বুনেছিল, নিজের অপরিসীম অসহায়তার মধ্যেই তার অবসান ঘটেছে—সামাজিক ভাষা ও দায় লঙ্ঘন করে তা চরিতার্থ করার পথ সে খুঁজে পায়নি; এমনকি সে চেষ্টাও করেনি। *লালসালুর* ভাষ্য এ ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মতো সূক্ষ্ম আর লক্ষ্যভেদী: 'জানানোর পথে বৃহৎ বাধার দেয়াল বলে রাত্রির এই মুহূর্তে অন্ধকার আকাশের তলে অসীম ক্ষমতাশীল প্রভুও অস্থির-অস্থির করে, দেয়াল ভেদ করার সূক্ষ্ম, ঘোরালো পন্থার সন্ধান করতে গিয়ে অধীর হয়ে পড়ে' (পৃ. ২২)। বস্তুত, মজিদ সামাজিক ভাষার এ ন্যায় লঙ্ঘন করেনি। করতে পারেনি।

৩.৪

সাজ্জাদ শরিফ (২০১৪: ৯৮) লক্ষ করেছেন, *লালসালুর* পাঠ এখনো 'ধর্মব্যবসা ও কবরপূজার সীমা পেরিয়ে বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারেনি।' তাঁর মতে, এভাবে ব্যাখ্যা করলে ওয়ালীউল্লাহ্ যে 'গোঁড়াপন্থি শরিয়া-অনুসারীদের' দলভুক্ত হয়ে ওঠেন, এবং 'ইসলামের এক রক্ষণশীল ব্যাখ্যাদাতায় পর্যবসিত' হন, সে কথাটাও এ ব্যাখ্যাকারেরা ভেবে দেখেননি।

উপন্যাসে ওয়ালীউল্লাহ্ যদি এ রকম মতাদর্শী হন, কিংবা কেউ যদি তাঁকে সেভাবে দেখতে পান, তাহলে তা প্রকাশ করা কোনো সমস্যার কারণ হওয়ার কথা নয়। তদুপরি, উপন্যাসে প্রকাশিত 'মতাদর্শ' লেখকের মতাদর্শ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না, অন্তত প্রত্যক্ষত—যদি রচনাটি উপন্যাসের নান্দনিক স্বভাব মান্য করে। তবে সাজ্জাদ শরিফের এ মন্তব্যে একটা গভীর সত্যের প্রতিফলন ঘটেছে। আমাদের সংশ্লিষ্ট আলোচক-সমালোচকগণ *লালসালুর* ধর্ম প্রসঙ্গে প্রায়শই এসব বর্গীয় ফারাক রক্ষা করেননি।

বশীর আলহেলাল (১৯৮৯: ৩৭) 'ধর্ম' এবং 'লালসালুর ধর্ম'—এ দুটি বর্গকে আলাদা করেছেন, তবে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেননি। এক জায়গায় লিখেছেন, 'ধর্ম ও সমাজ এই উপন্যাসে জড়াজড়ি ও মাখামাখি হয়ে আছে'। তাঁর মন্তব্য থেকে মনে হতে পারে, যেন কোনো সমাজে বা উপন্যাসে এরা আলাদা হয়ে থাকে। সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০১৫: ২১২) লিখেছেন,

'লালসালু একটি মৌলবাদবিরোধী উপন্যাসও বটে। বাঙালি মুসলমানসমাজ যে একদিন ধর্মব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়বে তার আভাস এই উপন্যাস থেকে পাওয়া গিয়েছিল।'

বোঝা যায়, উপন্যাসের অভ্যন্তর-সাক্ষ্যের তুলনায় নিজের ও সমাজের নানা অভিজ্ঞতাই এসব মন্তব্যের ভিত্তি। তবে *লালসালু*র ধর্ম প্রসঙ্গে বর্গীয় সতর্কতা রক্ষা করেই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। মোস্তাক আহমাদ দীন (২০১৪: ১৩৩-৩৬) লক্ষ করেছেন, মজিদের বৃত্তিগত পিরালি আর চর্চাগত শরিয়তি—এ দুয়ের মধ্যে উপন্যাসটি স্পষ্টতই গোলমাল পাকিয়েছে। পিরালির ঐতিহ্য-মোতাবেক গান-বাজনা ও স্বাধীন চিত্তবৃত্তির প্রতি মজিদের এ রকম খড়্গহস্ত হওয়ার কথা নয়। অন্য দিকে তার প্রচারিত বিধি-বিধান শরিয়তের কঠোর শাসনে বাঁধা। কাজেই, এ প্রাবন্ধিকের মতে, *লালসালু* পিরালি আর শরিয়তের বর্গীয় ন্যায় রক্ষা করতে পারেনি।

মোস্তাক আহমাদ দীন উপন্যাসটি পড়েছেন বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আমরা আগেই দেখিয়েছি, *লালসালু* সার্বিক অর্থে বাস্তববাদী উপন্যাস নয়—বাস্তববাদের কিছু কলা নৈপুণ্যের সাথে ব্যবহার করেছে মাত্র। কিন্তু প্রকল্পধর্মী রচনায়ও বাস্তবের ন্যায় রক্ষা করতে হয়। এ উপন্যাস তা রক্ষা করেছে। ব্যক্তিগতভাবে মজিদ শরিয়তপন্থি। শুধু প্রচারিত ধর্ম-কাঠামোর ক্ষেত্রে নয়, নিজের আচরণের ক্ষেত্রেও সে ধর্মচর্চায় নিষ্ঠাবান। পিরালি সে অবলম্বন করেছে নিখাদ ব্যবসা হিসাবে। সেখানে সংশ্লিষ্ট কিছু রীতি-রেওয়াজ সে পালন করে বটে; কিন্তু 'অন্তরের শক্তিতে' যে তার বিশ্বাস নাই, সে কথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। তদুপরি, *লালসালু*র ক্ষেত্রে এটা আসলে মজিদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস বা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারও নয়। মজিদ আবির্ভূত হবে এক সুনির্দিষ্ট ও কঠোর কাঠামো নিয়ে, যার ছত্রছায়ায় এক দিকে নিজের প্রতিষ্ঠা অন্য দিকে অন্যের অধস্তনতা সংঘটিত হবে—এ ঘটনা ধর্মীয় পরিসরে কেবল শরিয়তের মাধ্যমেই ঘটতে পারে।

*লালসালু*তে শরিয়তের বাড়াবাড়ির নিন্দা থাকলেও খোদ শরিয়ত সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক উচ্চারণ নেই। কিন্তু পিরতন্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিপক্ষতা আছে। পির-বিরোধী মনোভাব লেখকের দিক থেকে খুবই সাচ্চা; অথচ সমাজে যে পির-মাহাত্ম্য অতি প্রকট, তাও খুব স্পষ্ট। এ দুয়ের সন্তোষজনক মোলাকাত এ টেক্সটের অন্যতম অর্জন। মজিদ পির নয়, তার রুহানি শক্তির খ্যাতি নাই—তার নিজের সে কষ্টের কথা আন্তরিকভাবেই বলা হয়েছে। আর খালেক ব্যাপারি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'পীর নামের এমন মাহাত্ম্য যে, শয়তান ডেকেও সে-নামকে অন্তরে-অন্তরে লেবাসমুক্ত করা যায় না। গাভুর-চাষা-মাঠাইলরা পারলেও অন্তত বিস্তর জমিজমার মালিক খালেক ব্যাপারি তা পারে না। কিন্তু সাধারণ লোকে যেটা স্বচ্ছন্দে করতে পারে সেটা আবার তার দ্বারা সম্ভব নয়। তা হলো শয়তানকে শয়তান ডেকে সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার পীর ডাকা।' (পৃ. ৩০-৩১)

দুটি কথা এখানে খুবই স্পষ্ট। মজিদের আফসোস আর খালেক ব্যাপারির স্বীকৃতি প্রমাণ করে, *লালসালু*তে পির-প্রথা 'উচ্চতর' সংস্কৃতির অংশ হিসাবেই বর্ণিত হয়েছে। তুলনামূলক উচ্চ শ্রেণির মানুষ বলেই ব্যাপারি বেড়ে উঠেছে সে সংস্কৃতিতে জারিত হয়ে। কাজেই আওয়ালপুরের পির সম্পর্কে এত দ্রুত মন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কাজটা আমজনতা করলেও করতে পারে, কিন্তু খালেক ব্যাপারি নয়। অন্য দিকে, উদ্ধৃতির পরের অংশে, যেমনটা বলা হয়েছে মজিদের ক্ষেত্রে, খালেক ব্যাপারিকেও পরিষ্কারভাবে সামাজিক ভাষার অধীন করা হয়েছে। সে ভাষার ন্যায় লঙ্ঘন করা তার পক্ষে গোপনে সম্ভব হলেও হতে পারে—প্রকাশ্যে নয়।

এ ভাষার ধর্মনির্ভরতাই বস্তুত মজিদের শক্তির উৎস। *লালসালুর* ওয়ালীউল্লাহ্ যেভাবে মজিদ আর খালেক ব্যাপারির যৌথতায় মজিদকে প্রকাশ্য ও গোপন সক্রিয়তার কর্তা বানিয়েছেন, তা মোটেই বাস্তবসম্মত হয়নি। এ অভিজ্ঞতা বস্তুত ইউরোপীয় মধ্যযুগের, যেখানে চার্চ বিপুল সম্পত্তির মালিকানার কারণে রাজশক্তির উপর কর্তৃত্ব করার বিস্তর মওকা পেয়েছিল। এ ধরনের উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও ইউরোপসহ দুনিয়ার সর্বত্র এ যৌথতার জাহেরি অংশে যতই ধর্মগুরুর আধিপত্য থাকুক, বাতেনি অংশের কর্তা অর্থবান-ক্ষমতাবান মানুষেরাই ছিল। বলা যায়, ক্ষমতাবানেরা ক্ষমতার অংশ হিসাবে ধর্মসংশ্লিষ্ট ক্ষমতা-বলয়কে প্রভাবিত করে নিজেদের পক্ষেই সবসময় ব্যবহার করেছে। *লালসালুতে* এ ক্রম রক্ষিত হয়নি। কিন্তু ক্ষমতা-সম্পর্কের পাটাতনে সুবিধাজনক অবস্থান বিষয়ে নিগূঢ় সতর্কতার পরিচয় আছে। বলা হয়েছে, 'একজনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক' (পৃ. ৩১)। *লালসালু* খালেক ব্যাপারির তুলনায় মজিদকে অনেকটা উচ্চাসনে স্থাপন করেছে। এর এক তাৎপর্য হতে পারে এই যে, সেক্যুলার মহাবয়ানের তুলনায় ধর্মকেন্দ্রিক মহাবয়ানের ভাষা-কাঠামো ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা ও অধিকতর নিপীড়ক। বস্তুত, এ উপন্যাস সম্পর্কে এ ধরনের সিদ্ধান্তের পক্ষে যথেষ্ট নথি-প্রমাণ আছে।

কিন্তু সেই প্রমাণের ইন্ধন পেয়ে *লালসালুর* পাঠকদের একটা বড় অংশ যে উপন্যাসটিকে ধর্মবিরোধী বা পাকিস্তান-প্রকল্পের বিরোধী হিসাবে সাব্যস্ত করেছে, টেক্সটে তার পক্ষে কোনো সাক্ষী-সাবুদ নাই। পাঠ-সূত্রে, বা তাৎপর্য-সূত্রে, এমনকি নতুন দিনের নতুন বাস্তবতা-সূত্রে নিশ্চয়ই এ ধরনের ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু উপন্যাসে বরং এমন কিছু নমুনা পাওয়া যায়, যেখানে 'মডারেট ও স্বাতন্ত্র্যবাদী' দৃষ্টিভঙ্গিরই ইশারা মেলে।

আওয়ালপুরের পিরের বিবরণে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা যে ধরনের হাস্যরসাত্মক ও শ্লেষাত্মক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে লেখকের অবস্থান নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। মুসলমান সমাজের ভদ্রলোক-অংশে বিশের দশক থেকে যে মোল্লা ও পিরতন্ত্র-বিরোধী প্রচারণা ও প্রবণতা চলছিল, যার অংশ হিসাবে ফররুখ আহমদ ও আবুল হুসেনের মতো অনেকেই 'সৈয়দ' উপাধি বর্জন করেছিলেন, এবং কাজী নজরুল ইসলাম ও আবুল মনসুর আহমদের মতো অনেকে মোল্লাবিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন, একে তার নিরিখে পাঠ করা চলে। আওয়ালপুরের পিরের পরিচয় দিতে গিয়ে ইরান-তুরানের সাথে মিলিয়ে জন্ম ও বংশ-পরিচয় দেওয়ার যে রেওয়াজ ও বড়াইয়ের কথা শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বলা হয়েছে, সে দৃষ্টিভঙ্গিও সমকালীন বা পূর্ববর্তী 'মডারেট' মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি—মোটেই 'ধর্ম'-বিরোধী কিছু নয়।

তবে এ তালিকায় সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর নামটি হবে মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস। আমাদের প্রায় সকল আলোচনায় মজিদের বিপরীতে আক্কাসকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়

যেন মজিদ পাকিস্তানবাদীদের প্রতিনিধি, আর আক্কাস বিপরীত ঘরানার যুবক। কিন্তু *লালসালু*র ভাষ্য আসলে বেশ অন্য রকম। আক্কাস গ্রামে স্কুল গড়তে চায়। কেন? 'কোত্থেকে শিখে এসেছে ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই' (পৃ. ৪৫)। তদুপরি, পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, সে 'পাঁচ ওক্ত নামাজ' পড়ে। এ দুই তথ্য সেকালের মুসলমান সমাজের আধুনিকায়নের বস্তুত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সারাংশ ধারণ করে। এর সাথে 'ধর্ম' নামক বর্গের কোনো বিরোধ তো নেইই, উপরন্তু আক্কাস আসলে সমকালীন 'স্বাতন্ত্র্যবাদী' মুসলমান সমাজের সাথেই অধিকতর সাযুজ্যপূর্ণ।

*লালসালু*তে মজিদের সমস্যাটা এই নয় যে, সে ধর্মকে বা ধর্মবিশ্বাসের বিশেষ কাঠামোকে ব্যবহার করেছে; বরং সমস্যা হলো, ধর্মকাঠামো-নির্ভর চিহ্ন-ব্যবস্থায় বিদ্যমান ক্ষমতা-সম্পর্ক সে প্রয়োগ করেছে ছদ্ম-অথরিটির ভিত্তিতে, এবং নিপীড়নমূলক পন্থায়। ধর্মীয় বা পিরালির অথরিটির ধারণা বাতিল করার কোনো অভিলাষ *লালসালু*তে নেই। এ উপন্যাসের বিবেচ্য 'ধর্মের আগাছা'—খোদ ধর্ম নয়। ইডিয়লজি হিসাবে ধর্মকে বাতিল করে দেয়ার ঘটনা আছে ওয়ালীউল্লাহ্‌র *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাসে, যেখানে আরেফ আলী তার বিহ্বলকর সংকটে ধর্মাচারীদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য তো পায়ইনি, উপরন্তু স্কুলের কমনরুমে পাশে-বসা ধর্মশিক্ষকের কাছে এ রকম কোনো সুরাহা পাওয়ার সম্ভাবনাই বাতিল করে দিয়েছে। তবে, একজন আধুনিকতাবাদী হিসাবে ধর্মীয় ইডিয়লজির প্রতি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কোনো পক্ষপাত যে নাই, বরং বেশ কতকটা বিরূপতা আছে, সে সত্য তাঁর বিপুল রচনায় বিকীর্ণ হয়ে আছে।

৪

লালসালু উপন্যাসের নান্দনিক ও ভাবগত এ পটভূমিতে এবার জমিলার 'সক্রিয়তা' পরীক্ষা করা যাক।

মজিদের দ্বিতীয় বিয়ে প্রসঙ্গে অধিকাংশ সমালোচক যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা এনাক্রনিজম বা কালাতিক্রমী দোষের এক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় বিয়ে পুরোপুরি শরিয়তসম্মত, আর *লালসালু*র স্থান-কালের বাস্তবতায় সম্পূর্ণরূপে সমাজসম্মতও ছিল। বস্তুত, মজিদের আর্থিক-সামাজিক অবস্থানের কারো জন্য একাধিক স্ত্রী না থাকাই ছিল অস্বাভাবিক। মজিদ প্রতারক, আর সে কারণেই উজ্জ্বল জমিলার অনুপযুক্ত—এ ধরনের এক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্রয় দিয়ে আমাদের সমালোচকগণ ভাবালুতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নাবালক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে ঘরে আনার ব্যাপারেও সমালোচকদের এতটা বেচইন হওয়া ইতিহাসসম্মত হয়নি; কারণ *লালসালুর* ঘটনাকালের কাছাকাছি সময়ে এমনকি কলকাতার সংস্কৃতিবান-নাগরিক পরিসরেও দশের কাছাকাছি-বয়সি মেয়েদের বিয়ের ঘটনা আকসার ঘটত। 'ইসলাম ধর্ম', 'মুসলমান সমাজ', 'পিরপ্রথা', 'পাকিস্তান রাষ্ট্র' ইত্যাদি স্পর্শকাতরতায় মাত্রাতিরিক্ত আবিষ্ট না হলে বরং পাঠকের বিস্মিত হওয়ার কথা এই ভেবে যে, রহিমাকে এ বিয়ের ব্যাপারে সম্মত করানোর জন্য মজিদের এত চেষ্টা-চরিত্র করতে হলো কেন? শরিয়তে দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর সমর্থন প্রয়োজন হয়—লেখক কি মজিদকে দিয়ে এ বিধি মানানোর চেষ্টা করেছেন?

এ ক্ষেত্রে সন্তানজনিত যে যুক্তিগুলো মজিদ ব্যবহার করেছে, সেগুলো বহুল উচ্চারিত সামাজিক যুক্তিই বটে।

*লালসালু*র পাঠকদের গরিষ্ঠাংশ মজিদ-জমিলার দাম্পত্যকেও আমলে আনে নাই। এমনভাবে বর্ণনা করেছে যেন বা তাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু টেক্সট আমাদের ভিন্ন কথা বলে; একেবারেই বিপরীত ইশারা দেয়। যেদিন 'শণের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ' করল, সেদিনের কথাই ধরা যাক।

বুড়ির চিৎকারে 'সকালটা যেন কাচের মতো ভেঙে খান-খান হয়ে গেল।' মজিদ এ সময় বুড়িকে প্রবোধ দেয়ার জন্য যে কথা বলেছিল, তা এ রকম: 'ছেলে মরেছে, তার জন্য শোক করা উচিত নয়। খোদার যে বেশি পেয়ারের হয় সে আরো জলদি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে। এবার তার উচিত মৃত ছেলের রুহের জন্য দোয়া করা; সে যেন বেহেশ্‌তে স্থান পায়, তার গুনাহ যেন মাফ হয়ে যায়—তার জন্য দোয়া করা।' (পৃ. ৫১-৫২)

লক্ষণীয়, মজিদের এ বক্তব্য কোনো প্রকার শ্লেষ বা রঙ্গের ছোঁয়া ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। হবেই বা না কেন? দুনিয়াজুড়ে মুসলমানি সংস্কৃতিতে—শুধু মুসলমানি নয়, যে-কোনো ধর্মীয় সংস্কৃতিতে—মৃত্যুজনিত সান্ত্বনায় এ কথা বলাই রেওয়াজ। ধর্মীয় কাঠামোর বাইরে কথাটা একটু অন্য ভঙ্গিতে বলা হয়। কিন্তু 'ভালো নছিহতে কান নাই বুড়ির'; কারণ, শোকের স্তব্ধতায় এ প্রচলিত-প্রতিষ্ঠিত কথার সাথে কোনো কার্যকর যোগাযোগ-স্থাপনের সক্ষমতা সে হারিয়েছে। ঠিক এখানেই আবির্ভূত হয় জমিলা। ঘটনাক্রমে জমিলা বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। বুড়ির ভাষাতিরিক্ত বেদনা তাকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। সে স্তব্ধ হয়ে যায় বহু সময়ের জন্য। 'জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে।'

স্তব্ধ হয়ে জমিলা বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মজিদ এ স্তব্ধতার অনুবাদ করতে পারে না। জমিলার স্তব্ধতার কারণ সে জানে। একমাত্র নির্বাক স্তরেই এ জমিলার সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হতে পারত। কিন্তু মজিদ নৈঃশব্দ্যের উৎস তালাশ করে সামাজিক ব্যাকরণে: 'মন খারাপ হয়েছে? সে যদি হতো নানা রকম দায়িত্ব ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটানো মস্ত সংসারের কর্ত্রী—তবে না হয় বুঝত মন খারাপের অর্থ?' (পৃ. ৫২)। কাজেই মজিদের 'চিনচিনে রাগ' হঠাৎ গর্জনে রূপ নেয়। বলে, 'আমার দরজা থিকা উঠবার কও তারে। ও কি ঘরে বলা আনবার চায় নাকি?'

মজিদ এখানে যে ভাষা ব্যবহার করেছে, তাতে বিশেষ শত্রুতা বা বিরোধের কোনো ব্যাপার নাই। এটাই সাধারণ লোকভাষা। এমনকি পাঠক এ ভাষাকে যেন জমিলার সাথে দুর্ব্যবহারের কোনো লক্ষণ হিসাবে না পড়ে, সে ব্যবস্থাও *লালসালু* আগে করে রেখেছে। একই কথা তাকে রহিমাও বলেছে: 'হঠাৎ জমিলার দিকে তাকিয়ে ধম্‌কে ওঠে,—ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ওই রকম কইরা বসে না' (পৃ. ৫২)। রহিমার ধমকে জমিলা গা করে না। তার সাথে জমিলার প্রশ্রয়ের সম্পর্ক। কিন্তু মজিদের ধমক শুনে সে 'অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকায়'। তারপর চলে যায় গোয়ালঘরের দিকে।

সে রাতে ডোমপাড়া থেকে একটানা ঢোলকের আওয়াজ আসে। তার পটভূমিতে মজিদ ও জমিলা বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে দুই জগতের রাত্রি যাপন করে। দাম্পত্য-অভ্যাসের প্রমাণস্বরূপ এখানে দুটি বিপরীত মনের পরিচয় আছে। মজিদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে: 'ঘুমের আগে জমিলার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে খানিক আদর করা প্রায় তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়ালেও আজ তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত' (পৃ. ৫৩)। এ আদর কি একপাক্ষিক, যেমনটি আমাদের সমালোচকরা ব্যতিক্রমহীনভাবে দাবি করেছেন? না। উপন্যাসের ভাষ্যটি বরং একেবারেই অন্য রকম: 'হয়তো এই মুহূর্তে দুনিয়ার নির্মমতার মধ্যে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে-ওঠা জমিলার অন্তর একটু আদরের জন্য, একটু স্নেহ-কোমল সান্ত্বনার জন্য বা মিষ্টিমধুর আশার কথার জন্য খাঁ-খাঁ করে, কিন্তু মজিদের আজ আদর শুকিয়ে আছে' (পৃ. ৫৩)। মজিদের প্রতি জমিলার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আজতক যত মন্তব্য করা হয়েছে, তার প্রায় কোনোটিতেই এ দ্বৈততার সংকুলান হয়নি। সত্য বটে, তাদের দাম্পত্যে কোনো পারস্পরিকতা ও বিনিময় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু এটা দাম্পত্যই; আর জমিলার দিক থেকে এটা অস্বীকারের কোনো কারণও ছিল না, আয়োজনও ছিল না। কাজটা *লালসালুর* সমালোচকরা সম্পূর্ণ নিজ গরজে করেছেন। মজিদের মতো এক ভণ্ড-প্রতারক 'বিপ্লবী' জমিলার সাথে দাম্পত্য-যাপন করবে—এটা তারা ভাবতে চাননি বলেই এ সুস্পষ্ট বিবরণকে আমলে না এনেই উপন্যাসটি পড়ে উঠতে পেরেছেন।

অথচ, মজিদ-রহিমার দাম্পত্যজীবন বস্তুত মসৃণ। পুরুষতন্ত্র আর ধর্মতন্ত্রের যৌথতায় দুনিয়াজুড়ে হাজার হাজার বছর ধরে সংশ্লিষ্ট নারীরা যে ধরনের দাম্পত্যকে আদর্শ বলে ভেবে এসেছে, রহিমার জীবন তার চেয়ে কোনো দিক থেকেই ঊন নয়। সত্যি বলতে কী, ধর্মীয় বিধান ছাড়া—যার সবকটিই রহিমার ধর্মবোধেরও অন্তর্গত—দুনিয়াবি কোনো ব্যাপারে মজিদ এমনকি বাড়তি কর্তৃত্বও করেনি। জমিলার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা যে ওই রকম জমে ওঠে নাই, তার প্রাথমিক দায় জমিলার। সে বস্তুত দাম্পত্য-ভাষার জগতেই প্রবেশ করে নাই। অন্তত *লালসালুর* পরিসরে মজিদ না হোক, রহিমার সাথে তার কথোপকথনে এমন একটা লক্ষণও প্রকাশিত হয়নি, যেখান থেকে পাঠক তার সংসার-জ্ঞানের কোনো পরিচয় পাবে। মজিদ বরং শুরুতে স্বভাবের বিপরীতে গিয়ে জমিলার প্রতি তরল আচরণ করছিল—'তার আশপাশ আতরের গন্ধে ভুরভুর করে।'

খ্যাংটা বুড়ির ঘটনাসহ পরের প্রতিটা ঘটনা পরম যত্ন ও সূক্ষ্মতায় এ 'অ-সামাজিক' জমিলারই সুরত নির্মাণ করেছে। জমিলা জিকিরের সময় বাইরে মাজারের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। জমিলার উপস্থিতি টের পেয়ে জিকিররত পুরুষদের তাল কেটে যায় বটে, বলা যায়, একটা অব্যাখ্যেয় বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়; কিন্তু এ ঘটনাকে অধিকাংশ সমালোচক যে মাজারকেন্দ্রিক রীতি-রেওয়াজের বিরুদ্ধে জমিলার অবস্থান হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন, উপন্যাসে তার ন্যূনতম সমর্থনও নেই। পুরো ঘটনা নিঃসন্দেহে মজিদের মাজারকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যকে এক ধরনের রসিকতার মুখোমুখি করে দেয়; কিন্তু জমিলার সচেতন এমনকি অচেতন ইচ্ছার সাথেও তার দূরতম সম্পর্ক নাই। লেখক এখানে সামষ্টিক জিকিরের বর্ণনা দিয়েছেন। সে বর্ণনা এক দিকে বিমূর্তকে মূর্তিমান করার সৌন্দর্যে অসামান্য, অন্য দিকে জিকিরের অতি রহস্যময়

আওয়াজ আবেগি জজবার তোড়ে উচ্চস্বরি এবং অর্থহীন শ্রুতি হয়ে জমিলার কান পর্যন্ত যেভাবে পৌঁছায়, তার বাস্তবতা তৈরির ক্ষেত্রেও মোক্ষম। অনভিজ্ঞ জমিলা সে আওয়াজের রহস্যময়তাকে ধারণ করতে পারে না। অন্তত তিনবার সে রহিমার শরণাপন্ন হয়। রহিমা ব্যস্ত থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত সবার অগোচরে পৌঁছে যায় মাজারের কাছাকাছি। পুরো ব্যাপারটা একটা চোস্ত কমেডি তৈরি করলেও অন্তত পৃষ্ঠা দুয়েকের তীক্ষ্ণ নির্মাণ পাঠককে এ মর্মে নিশ্চিত করে যে, ঘটনাটা জমিলার সচেতন সিদ্ধান্তের ফল নয়।

মজিদের মুখে থুথু দেয়ার উপাখ্যানেও অন্য রকম ব্যাখ্যার প্রত্যক্ষ সুযোগ নাই, এমনকি ইশারাও নয়। জমিলা দীর্ঘসময় নামাজ পড়েছিল—মজিদের কথামতো অতিরিক্ত নামাজ। একসময় সেজদার মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে মজিদ তাকে 'সেদিনকার মতো হ্যাঁচকা টান মেরে বসিয়ে দেয়'। সাথে গোঁ-গোঁ করা ক্রোধ আর চাপা গর্জন। টান মেরে মজিদ তাকে নিয়ে চলে বাইরের দিকে। 'বিভ্রান্ত জমিলা' হঠাৎ বুঝতে পারে তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এমনিতেই মাজারে তার ভয়। তদুপরি সেদিন সকালে মজিদ যে গল্প বলেছিল, তাতে ভয়টা আরো ঘনীভূত হয়েছে। মজিদের হাতের বাঁধন আলগা করার সব রকম চেষ্টাই সে করেছে। 'অনেক চেষ্টা করেও হাত যখন ছাড়াতে পারল না তখন সে অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল। হঠাৎ সিধা হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করল।' (পৃ. ৬১)

কাজেই অধিকাংশ সমালোচক যেভাবে ঘটনাটিকে মজিদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষবশত থুথু-নিক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন, বাস্তবতা তার ধারে-কাছেও কিছু নয়। ঘটনা-পরবর্তী প্রতিক্রিয়াও স্পষ্টভাবে সে কথাই বলে। মজিদ রহিমাকে থুথু দেয়ার কথা বললে রহিমা তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে। তার আর্তনাদ শুনে জমিলা মুহূর্তেই মনে-প্রাণে স্তব্ধ হয়ে যায়। সে স্তব্ধতা তার মাজারে পৌঁছানোর পরেও কাটেনি। নিজের আচরণের কোনো ন্যায্যতা সে মনে মনেও খাড়া করেনি। আসলে সে কিছু ভাবেইনি। স্পষ্টতই থুথু নিক্ষেপের ঘটনা ছিল জমিলার জৈব-অস্তিত্ব রক্ষাজনিত প্রতিক্রিয়া।

পাঠকের সরল আকাঙ্ক্ষা আর *লালসালু*-প্রস্তাবিত জটিল বাস্তবতার মধ্যকার বৈপরীত্যের আরেক উদাহরণ জমিলার নামাজ-কাণ্ড। জমিলা নানা ছলে নামাজ পড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, আর এর ফলে প্রতারক মজিদ যথেষ্ট মাত্রায় শায়েস্তা হয়েছে—এ রকম এক সরল মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন বেশিরভাগ সমালোচক। কার্যত এ বাক্যের প্রথমাংশ একেবারেই ঠিক নয়, আর দ্বিতীয়াংশ খুব পরোক্ষভাবে কিছু তাৎপর্য ধারণ করে। জমিলা আসলে নামাজ পড়তে শুরু করেছিল। শুধু ঘুমের কারণে এশার নামাজ মাঝে-মধ্যে বাদ পড়ছিল। মনে খোদার ভয় থাকলে নামাজের চেয়ে ঘুম বেশি প্রাধান্য পেতে পারে না—এ যুক্তি মজিদের। পাঠক যেন এ যুক্তির বশীভূত না হয়, সে ব্যাপারে উপন্যাসের বয়ান এতটাই সচেতন ছিল যে, পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে, 'নিদারুণ ঘুমের জন্য' 'নামাজ তো দূরের কথা, খাওয়াই হয়ে ওঠে না।' ব্যাপারটাকে পুরোপুরি জৈব স্তরে রাখার জন্য এর পরপরই যোগ করা হয়েছে আরেক বাক্য: 'যে-রাতে অভুক্ত থাকে তার পরদিন অতি ভোরে উঠে ঢাকাঢুকা যা বাসি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে' (পৃ. ৫৩)। এমনকি দীর্ঘ-নামাজের সে বিভীষিকাময় রাতেও

সেজদায় ঘুমিয়ে পড়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'দস্যুর মতো আচমকা এসেছে সে-ঘুম, এক পলকের মধ্যে কাবু করে ফেলেছে তাকে।' (পৃ. ৬১)

এ রকমই হওয়ার কথা। 'ধর্ম' বিষয়ে অকারণ অপরতার বোধ না থাকলে *লালসালুর* কোনো পাঠকেরই এ রকম মনে হওয়ার কারণ নাই যে, নামাজ মজিদের আবিষ্কার কিংবা আল্লাহ মজিদের মালিকানাধীন, কাজেই এর লঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে মজিদ শায়েস্তা হবে। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই মজিদের পরাভব ঘটেছে। তবে তা এত সরল 'বিদ্রোহে'র মামলা নয়। উপন্যাসে জমিলা প্রসঙ্গে বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে। তবে তা মোটেই মজিদের মতাদর্শিক অবস্থান বা কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নয়। 'তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে' তার প্রতি হওয়া অন্যায়-হেতু। সেদিন এশার নামাজ সে পড়েছে। বহু কষ্টে আধা ঘণ্টা 'টান হয়ে' বসে থেকে নামাজ পড়ে ঘুমিয়েছে। কিন্তু মজিদ বা রহিমা সেটা জানত না বলে তাকে 'কাঠের মতো' ঘুম থেকে নিষ্ঠুরভাবে তুলে দেয়। তাতেই সে বিদ্রোহী হয়েছে। কিন্তু এ বিদ্রোহের স্বরূপ পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত হয়েছে: 'সে উঠবেও না, কিছু বলবেও না। কোনো কথাই সে বলবে না। নামাজ যে পড়েছে, এ কথাও না' (পৃ. ৫৪)। এটুকু প্রশ্রয় পেয়েই অনেক সমালোচক জমিলার মধ্যে এক সর্বব্যাপী বিদ্রোহমূলক প্রতিবাদের সক্রিয়তা আবিষ্কার করেছেন, যা কিনা মজিদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে মাজার ও ধর্মসমেত ডুবিয়ে দিয়েছে। এ পাঠ কোনো টেক্সটকে ইচ্ছাপূরণের গল্প হিসাবে পাঠ করার নমুনা বৈ নয়।

জমিলার কর্তাসত্তা এবং তজ্জনিত ঘৃণা ও প্রতিবাদ কার্যত এই ইচ্ছাপূরণের গল্প থেকেই উদ্ভূত—*লালসালু* থেকে নয়।

৫

কিন্তু *লালসালু* উপন্যাসের যে-কোনো পাঠ থেকেই নিশ্চিন্তে বলা যায়, জমিলা মজিদের শত্রু হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল—যেমন মজিদ জমিলার; আর এ দ্বৈরথে মজিদের যে শুধু পরাজয় ঘটেছে তা নয়, তার যথেষ্ট শিক্ষাও হয়েছে। মজিদ 'সহি' হয়ে উঠতে পারে নাই তার অস্তিত্বগত সংকটের কারণে; কিন্তু এ শিক্ষা ভুলে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। তার অন্যতম—হয়তো প্রধান—কারণ, জমিলা রহিমাকেও নিজের দলে ভিড়িয়েছে। যে কৌশলে *লালসালুর* ওয়ালীউল্লাহ্ এ শিক্ষাপর্ব সম্পন্ন করেছেন, এবং এর মধ্য দিয়ে ব্যষ্টিক-সামষ্টিক অস্তিত্বের এক নিগূঢ় নিরীক্ষায় কামিয়াব হয়েছেন, তা সমুন্নত সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে জমিলার পূর্বোক্ত 'নিষ্ক্রিয়' সক্রিয়তার তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করা জরুরি।

৫.১

জমিলা যখন মজিদের ঘরে আসে, তখন প্রথমে তাকে অতিরিক্ত নাজুক বলেই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, ভীতি তার সর্ব-অস্তিত্বের ব্যতিক্রমহীন সহচর। কিন্তু উপন্যাসের ভাষায়, মজিদ ও রহিমা দুজনেই ভুল ভেবেছিল। কারণ, দিন কয়েকের মধ্যেই তার 'আসল চরিত্র' প্রকাশ পায়। কী করে সে? প্রথমে ঘোমটা খোলে, তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে। ধীরে ধীরে তার মুখও ফুটতে থাকে।

এই 'আসল চরিত্র'ই জমিলার অন্যতম প্রধান জটিলতা—'ভুলপাঠে'রও প্রধান উৎস। জমিলা মুখ খোলে বটে, কিন্তু প্রথমত, তা রহিমার কাছে, মজিদের কাছে নয়। দ্বিতীয়ত, রহিমার কাছে মুখ খুললেও নিজের প্রসঙ্গে সে এমন একটা কথাও বলেনি, যা থেকে রহিমা তার অভিজ্ঞতালব্ধ সামাজিক ভাষার কাঠামোর মধ্যে জমিলাকে স্থাপন করতে পারবে। যেমন, জমিলা একবারও সতীন হিসাবে আচরণ করেনি। সংসারের অভ্যন্তর-কাঠামোয় নিজের কোনো স্থানও দাবি করেনি। তাকে নাজুক দশায় দেখে রহিমার মনে যে 'শাশুড়ির ভাব' জেগেছিল, এ কারণেই শেষ পর্যন্ত তাতে কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

জমিলা যে বলেছে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে মজিদকে দেখে তার মনে হয়েছে, 'তানি বুঝি দুলার বাপ', আর মজিদের ঘরে রহিমাকে দেখে মনে হয়েছে 'শাশুড়ি', সে কথাটা বয়সজনিত অসঙ্গতি হিসাবেই সাধারণত পাঠ করা হয়। আর এদিক থেকেই মজিদ-জমিলার বিয়েকে ভাবা হয় অন্যায্য। কিন্তু এ পাঠই বরং হাস্যকর। কারণ, ওই সামাজিক ভাষায় বয়সের এ ফারাক মোটেই অসঙ্গত ছিল না। বস্তুত, নিকট অতীতের আংশিক ব্যতিক্রম বাদ দিলে ইতিহাসের সমস্ত স্থান-কালেই নারী-পুরুষের এই বয়সজনিত ফারাককে ন্যায্য ভাবা হয়েছে। কাজেই, জমিলার এই 'কথা' আসলে 'সামাজিক কথা'য় তার অনধিগম্যতারই প্রকাশ—এ কথা যে বলা যাবে না, সে বোধের অভাবের অব্যর্থ প্রমাণ। অধিকতর প্রমাণের বন্দোবস্ত খোদ লেখকই করেছেন। আমাদের কাহিনিখোর পাঠক-সমালোচকরা মোটেই খেয়াল করেননি যে, 'দুলার বাপ' আর 'শাশুড়ি' মনে হওয়ার রঙ্গটা পুরো ঘটনার পূর্বরাগ মাত্র। মূলকাণ্ডে রহিমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে জমিলার দমফাটা হাসি অকস্মাৎ রূপান্তরিত হয় অঝোর কান্নায়। বলে রাখা ভালো, *লালসালুর* জোরালো রঙ্গ-ব্যঙ্গের মধ্যে গভীরতর কান্না ও বেদনার সংস্থান যে খুব প্রত্যক্ষ, সে কথাটি আজতক প্রায় আড়ালেই থেকে গেছে।

জমিলা আসলে বুঝতেই পারেনি কেন রহিমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। সতীনকে তার শাশুড়ি মনে হয়েছে—এ কথার সামাজিক অন্যায্যতা সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না। কাজেই রহিমার গম্ভীর হয়ে ওঠার কারণ বুঝতে না পেরে সে শুরু করল কান্না। রহিমা কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলতে পারে না—বানিয়ে বলে যে, বাড়ির জন্য এবং 'নুলা ভাইটি'র জন্য সে কাঁদে। কারণ যাই হোক, হাসি ও কান্না উভয়েই ভাষা-পূর্ব জৈব-অস্তিত্বের প্রকাশ। ভাষায় যে আড়াল থাকে, হাসি-কান্না তা থেকে অনেকটাই মুক্ত—বিশেষত আবেগের আতিশয্যে ভাষিক কার্যকরতা যখন অনেকটাই শিথিল হয়ে আসে। রহিমার সাথে জমিলার এ ক্ষেত্রে কোনো ভাষিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু ব্যাখ্যাতীত হাসি-কান্নার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে ভাষাতীত যোগাযোগ। এ কারণেই তার পক্ষে সামাজিক কাঠামোর যাবতীয় চিহ্ন-ব্যবস্থা অতিক্রম করে—এমনকি শেষ পর্যন্ত মজিদের ছায়াকেও—আংশিকভাবে জমিলার সহযাত্রী হওয়া সম্ভব হয়েছে।

সামাজিক ভাষার পূর্বাবস্থাই যে *লালসালুর* পরিসরে জমিলার প্রধান পরিচয় এবং অন্য সকল পরিচয়ের ভিত্তি, উপন্যাসটি সে সত্যকে বোঝাবুঝি বা অনুমান-বিশ্লেষণের স্তরে না রেখে বহুবার সরাসরি প্রকাশ করেছে। সবচেয়ে মোক্ষম প্রকাশটি ঘটেছে ঢোলক-বাজা রাতের ঘটনায়। মজিদ ঘুম থেকে জেগে জমিলাকে বিছানায় না পেয়ে কুপি জ্বালিয়ে খুঁজতে বের

হয়। দেখে, 'রহিমার প্রশস্ত বুকে মুখ গুঁজে জমিলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে।' এবং এরপরই সেই অব্যর্থ ইঙ্গিত—'কুপিটার লালচে আলো মুখে পড়তেই তার ঠোঁটটা একটু নড়ে উঠল—যেন মাই খেতে-খেতে ভুলে থেমে গিয়েছিল, আলো দেখে হঠাৎ স্মরণ হলো সে-কথা।' (পৃ. ৫৩)

জাক লাকাঁর ব্যাখ্যাসূত্রে Lois Tyson (2008: 31-32) লিখেছেন:

> The symbolic order dominates human culture and social order, for to remain solely in the Imaginary Order is to render oneself incapable of functuning in society. Nevertheless, the Imaginary Order makes itself felt through experiences of the kind the *Symbolic Order would classify as misinterpretations, misunderstandings, or errors of perception.* That is, the Imaginary Order makes itself felt through any experience or view point that *does not confirm adequately to the societal norms and expectations* that constitute the Symbolic Order. (বাঁকা হরফ সংযোজিত)

এ ব্যাখ্যা ধার করে বলতে পারি, জমিলার অধিষ্ঠান মুখ্যত 'ইমাজিনারি অর্ডারে'—সামাজিক কেতা ও চাহিদায় গড়া 'সিম্বলিক অর্ডার' তার অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। মোটেই বিস্ময়কর নয়, তার ভাষা, প্রতিক্রিয়া ও আচরণ বোঝাবুঝির বাইরেই থেকে গেছে—কেবল মজিদ নয়, রহিমাও বারবার বলেছে সে কথা।

এ জমিলাই আসলে 'দু-দিনের মধ্যে ভাবিয়ে তোলে মজিদকে।' কোন জমিলা? যে ভাষার সিম্বলিক কাঠামোয় প্রবেশ করে নাই। মনে পৌঁছানোর সদর রাস্তা তো ভাষা। সামাজিক ভাষা। মজিদ মনের ও স্বভাবজ প্রকৃতির অনির্বচনীয়কে উপলব্ধি করলেও তাকে প্রবলভাবে বাধা দিয়ে, প্রবৃত্তির দুর্দমনীয় স্রোতকে সম্পূর্ণ কৃত্রিমভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে, আশ্রয় নেয় কঠোরতম ভাবাদর্শিক ভাষার। কাজেই মজিদের সাথে জমিলার কথোপকথন চলতে পারে না। চলে রহিমার সাথে। কারণ, সেখানে বোঝাবুঝির তুলনায় উপলব্ধির পরিমাণ বেশি। সেখানে প্রাক-ভাষিক পূর্ণতা প্রশ্রয় পায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রহিমার সাথে জমিলার পারস্পরিকতা পরীক্ষা করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, খাঁটি সামাজিক ও সাংসারিক অর্থে তারা কোনো কথা বলেনি। রহিমার পক্ষ থেকে উপলব্ধির উষ্ণতাই তাদের মধ্যকার প্রগাঢ় সম্পর্কের ভিত্তি।

এ জমিলার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের কোনো তরিকাই মজিদের জানা নেই। 'সিম্বলিক অর্ডারে'র উপর তার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। কিন্তু সে জগতে যে প্রবেশই করেনি, তাকে মজিদ কীভাবে বশীভূত করবে? তার যে হাহাকার, কর্তব্য স্থির করতে পারার পরম ব্যর্থতা, এবং তজ্জনিত ভীতি—এর উৎস বস্তুত তার নিজেরই সিদ্ধান্তজনিত অন্যায্যতা। মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের বাইরেও জৈবিক অস্তিত্ব থাকে—প্রাকৃতিকতা থাকে। মজিদ তার জৈব-অস্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ততা বিসর্জন দিয়েছে; নিজের এবং অন্য সকলের প্রাকৃতিকতা লঙ্ঘন করেছে। বস্তুত সে প্রকৃতির আইন ভঙ্গ করেছে। গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিসের আন্তিগোনে ভাইয়ের মৃতদেহ সৎকারের জন্য দাবি করেছিল 'প্রাকৃতিক আইন', যা রাষ্ট্র-নির্ধারিত আইনের অধিক। এ সূত্র অনুসরণ করে বলা যায়, মানুষের অস্তিত্ব 'সিম্বলিক অর্ডারে'রও পূর্বগামী, যাকে বলতে পারি প্রাকৃতিকতা। *লালসালু* শুরু থেকেই নির্মাণ করে গেছে প্রাকৃতিকতার পরিসর; আর মজিদ

ক্রমাগত লঙ্ঘন করেছে সে অস্তিত্ব। শেষ পর্যন্ত জমিলার প্রচণ্ড প্রাকৃতিকতায় তাল মেলানোর কোনো সক্ষমতাই তার আর অবশিষ্ট থাকেনি।

৫.২

মাটির প্রতি এবং মাটিতে উৎপাদিত ফসলের প্রতি মহব্বতনগর গ্রামের মানুষের যে আন্তরিক টান, তার মূলে নিঃসন্দেহে জীবদেহ রক্ষার প্রণোদনাই প্রধান। কিন্তু লেখক এ বাবদ আনন্দ-উল্লাসের যে স্বাভাবিকতা অঙ্কন করেছেন, তাকে শুধু এ জৈব-প্রণোদনা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। স্পষ্টতই তাদের এ জীবনাচারে প্রকৃতির সমর্থন আছে; আর তাদের উল্লাস এবং গানের দিলখোলা টান উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রকৃতির সমর্থন নিয়েই জীবনের আবেগ ও উৎকণ্ঠার সহচর হয়। *লালসালুর* লেখক মহব্বতনগরবাসীর এই প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতাকে যে বিশেষ জীবনধর্ম হিসাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন, তার এক প্রমাণ এই যে, হাসুনির মায়ের ক্ষেত্রেও তিনি একই ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেছেন (পৃ. ১৪)। বতোর দিনে পরিশ্রমে তার কোনো ক্লান্তি হয় না, বরং মুখে চিকনাই দেখা দেয়। 'ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে।' জীবনের এই স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসকে বলা যেতে পারে জীবনের প্রকৃতিসম্মত ধর্ম। ধর্মীয় আচার কিংবা ধর্ম-প্রসূত ভাবাদর্শ সে জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ।

এ স্বাভাবিকতায় মজিদ প্রবেশ করে অস্বাভাবিকতা নিয়ে। এমনিতেই ধর্ম ও অপরাপর আচারে 'শুদ্ধতা'র দাবি খুব স্বাভাবিক ও সর্বজনীন ঘটনা, যাকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় 'সংস্কৃতায়ন' বলা যেতে পারে। কিন্তু মজিদের ক্ষেত্রে আরো প্রবল সত্য এই যে, অস্তিত্বের সংকট হতে পারে এমন আশঙ্কা থেকে সে এক দিকে স্বাভাবিকতাকে মাত্রাতিরিক্ত বল ও কৌশলে বাধাগ্রস্ত করেছে, অন্য দিকে অস্বাভাবিক ভয়ে সবাইকে তটস্থ করেছে। 'তথাকথিত মাজারের পানে চেয়ে ক্বচিৎ কখনো সে যে ভাবিত না হয় তা নয়। কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সে-কথাটা সে-সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে' (পৃ. ৭)—এ পর্ব ছাড়িয়ে ক্রমে সে অভ্যস্ত হয়েছে নতুন চর্চায়: 'আর যাই হোক, মজিদের কথাকে যে অবহেলা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায় তাকে সে মাফ করতে পারে না' (পৃ. ৩৬)। এ অবস্থান ও চর্চাকে জৈব-অস্তিত্বের অনিবার্য চাহিদা বলা যায় না।

সামাজিক ভাষার চাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত জমিলা চরিত্রটি মজিদকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। বাইরের ঘর থেকে মজিদ শুনেছিল জমিলার 'সোনালি মিহিসুন্দর হাসির ঝঙ্কার'। 'কয়েক মুহূর্ত বিমুগ্ধ মানুষের মতো' সে 'স্তব্ধ হয়ে থাকে'। কিন্তু সে তার নিজের হাতে গড়া নিয়তির নিগড়ে বন্দি। তার পক্ষে এই স্বভাবজ প্রাকৃতিকতা উদযাপন করা সম্ভব হয় না। কারণ, সামনে বসা লোকটির কাছে সে যে ন্যায়ে আবদ্ধ—শুধু মাজারকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের কারণে নয়, শরিয়তের কট্টরপন্থার সমর্থনেও বটে—সে ন্যায় তাকে অবিলম্বে ঠেলে দেয় নির্ধারিত কাঠামোয়। 'হঠাৎ সে শক্ত হয়ে যায়। মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে, আর কুঁচকে যায় ভ্রূ।'

জমিলার সাথে মজিদের দ্বৈরথ মুখ্যত স্বভাবজ প্রাকৃতিকতার বিপরীতে কাঠামোবদ্ধ অনুশাসনের নিপীড়নমূলক বাড়াবাড়ির বিরোধ।

*লালসালু*র পাঠকরা সাধারণভাবে মজিদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিবাদকারীদের তালিকায় জমিলাকে যুক্ত করেন, আর তাকে এক ধারাবাহিকতার চূড়ান্ত রূপ হিসাবে স্থাপন করেন। যেমন, সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৯৭: ৮৫) লিখেছেন, 'বৃদ্ধ তাহেরের বাপের মাঝে যে নির্ভীক বিদ্রোহী সত্তার উৎসার, বালিকা-বধূ জমিলার মাঝে তার প্রকাশ।' আমরা আগেই দেখিয়েছি, 'নির্ভীক বিদ্রোহী সত্তা' অভিধাটি জমিলার ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া প্রকৃতিগতভাবেও পূর্ববর্তীদের তুলনায় জমিলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমেনা বিবির অতি স্বাভাবিক বাসনার প্রতিক্রিয়ায় মজিদ ন্যায়ের যাবতীয় সীমা লঙ্ঘন করলে রহিমা বোধের অতীত অনুভূতিতে আক্রান্ত হয়েছিল। 'দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহিমা বিড়বিড় করে বলে,—তুমি এত দয়ালু খোদা, তবু তুমি কী কঠিন।' এর পরপরই: 'সে বিড়বিড় করে আর আওয়াজটা এমন শোনায় যেন মাজারের সালু কাপড়টা ছেঁড়ে ফড়ফড় করে। মুহূর্তের জন্য চমকে ওঠে মজিদ' (পৃ. ৪৪)। রহিমার অন্তর্লীন জীবনধর্ম এভাবে মজিদের মনে ভীতি তৈরি করে। শিলাবৃষ্টির রাতে ওই জীবনধর্মকে দলিত হতে দেখে তার আনুশাসনিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে—সে চলে যায় মজিদের শাসন-শৃঙ্খলের বাইরে।

রহিমার যে বোধ জন্মেছিল বাহ্য-ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়, জমিলার তা নিত্যসঙ্গী। যে-কোনো নিপীড়ক চিহ্ন-ব্যবস্থাকে স্রেফ আমলে না এনে গুঁড়িয়ে দেয়ার শক্তি তাই তার সহজাত। Lois Tyson (2008: 32) লিখেছেন:

> One might even argue that the profound value of the Imaginary Order lies in the very fact of its not controlling our lives the way the Symbolic Order does. Ironically, it is this "lack" of control that probably offers us the only resistance we have to the ideological systems that constitute the Symbolic Order.

ভাষিক শৃঙ্খলা আর কাঠামোগত আরোপণের পূর্ববর্তী জমিলা তাই নিজেই মূর্তিমান প্রতিরোধ। এ দ্বৈরথে তাই মজিদের পরাজয় অনিবার্য ছিল। প্রথমে থুথুর তোড়ে সে বিধ্বস্ত হয়, আর শেষে মেহেদিরঙা পায়ের প্রতীকী আক্রমণে তার নৈতিক পরাজয় সম্পন্ন হয়। কিন্তু ভোলার উপায় নাই, পরাজয়টা এক দিকে নৈতিক ও প্রতীকী; অন্য দিকে পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে বিশুদ্ধ পারিবারিক পরিমণ্ডলে—আবেগের এলাকায়; সামাজিক পরিসরে নয়। সামাজিক চুক্তি, যুক্তি কিংবা আইনি পরিসরে তা সংক্রমিত হওয়ার কোনো ইশারা অন্তত *লালসালু*র চৌহদ্দিতে পাওয়া যায়নি।

৬

সাজ্জাদ শরিফ (২০১৪: ৯৮) লিখেছেন, 'ক্ষমতার উৎস ও তার পরাক্রম এবং উন্মূল ক্ষমতা ও ক্ষমতাসীনের জটিল সম্পর্কের বিচারের দিক থেকে *লালসালু*র আরেকটি পাঠের প্রবল সম্ভাবনা থেকে গেছে।' এরপর তিনি মজিদকেন্দ্রিক ক্ষমতা-সম্পর্কের যে ইশারা দিয়েছেন, তা অবশ্য ইংরেজি ও ফরাসি সংস্করণের ক্ষেত্রেই অধিকতর প্রযোজ্য। কিন্তু *লালসালু* নিয়েই

সন্তোষজনকভাবে এ আলাপ চলতে পারে। কাঠামোগত ডিসকোর্সের অধীশ্বর হিসাবে মজিদকে আর ডিসকোর্স-পূর্ব অস্তিত্ব হিসাবে জমিলাকে উন্মোচনের মধ্য দিয়ে *লালসালুর* কাঠামোয় যে রূপক-সম্ভাবনা তৈরি হয়, তাতে ক্ষমতা-সম্পর্কের বাইরে আরো বহু ক্ষেত্রের সংকুলান হতে থাকে। দেশপ্রেম, সেক্যুলারবোধ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের মতো ধর্মের সাথে তুলনীয় যে-কোনো মহাবয়ান ও মতাদর্শ এ রকম অথরিটি তৈরি করে, আর তার সাথে সাথে তৈরি হয় অধস্তনতার সম্ভাবনা। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবনের নানা সারসত্য উন্মোচনের একটা কার্যকর কাঠামোও তাতে দানা বাঁধতে থাকে। অন্তর্নিহিত মানব-সত্য, বিশেষত সামষ্টিক জীবন ও আন্তঃব্যক্তি-সম্পর্কের কিছু বুনিয়াদি সংকট এভাবে ধ্রুপদি আকার পায় *লালসালুর* নান্দনিকতায়।

শিল্পী তাঁর সমকালীন ভাব-স্বভাবের খুবই 'অগ্রসর' অংশের ব্যক্তিত্ববান রূপায়ণ করেন বলে যে কথা শিল্পের বাজারে চালু আছে, সে কথা ধার করে বলতে পারি, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। কিন্তু পাঠ-সংস্কৃতির ঊনতা এবং নগদ লাভের হাতছানি অনেক সময় সমকালীন আম-পাঠক তো বটেই বোদ্ধা-পাঠককেও যে প্রতারিত করতে পারে, *লালসালুর* জমিলা-কাণ্ড প্রকৃতপক্ষে তারই এক কার্যকর নজির। নগদ লাভ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয় 'বাস্তবতা'র ছদ্মবেশে, যেখানে শিল্পকলার উপাদানগত বাস্তবকে জীবনযাপনগত বাস্তবের সমান্তরালে পাঠ করার উদ্যোগ শিল্প-পাঠের স্তরকে উপাদানগত পাঠের স্তরেই সীমিত রেখে দেয়—উপাদানের অমিত সমবায়ে যে গভীরতর মাত্রার সম্ভাবনা স্রষ্টার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে জমা হতে থাকে, সেগুলোকে অধরাই রেখে দেয়। সাধারণভাবে *লালসালু*, আর বিশেষভাবে জমিলা এ ধরনের ব্যস্ততার শিকার হয়েছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রটির ঘোষিত-অঘোষিত প্রধান 'ইডিয়লজিকেল স্টেট অ্যাপারেটাস' ছিল 'ইসলাম', আর রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ধর্মে'র নামে—এ দুই 'বাস্তবতা'র সাথে *লালসালুর* অব্যবহিত সাদৃশ্য তৈরি করতে পারা ওই ত্বরিত সিদ্ধান্তের ভিত্তি। আশির দশকের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ব্যাপকভাবে পঠিত হয়েছিলেন 'আধুনিক', 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী', 'সেক্যুলার' ও 'মৌলবাদবিরোধী' সাহিত্যিক হিসাবে। পাঠ-শাস্ত্র অনুযায়ী এসব পাঠে আপত্তি করার কোনো সুযোগ নেই। বর্তমান রচনায় শুধু দাবি করা হয়েছে, এসব পাঠে টেক্সটের অভ্যন্তর-সাক্ষ্য ব্যবহারে যথেষ্ট ঘাটতি দেখা গেছে। ঘাটতির মূল কারণ অব্যবহিত বাস্তবের সুবিধাজনক ভাষ্য প্রস্তুত করা।

সেদিক থেকে বিচার করলে *লালসালুর* পাঠ আমাদের পাঠ-সংস্কৃতির দীনতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক ঊনতারও পরিচয় বহন করে।

টীকা

১. এ মন্তব্যের পরোক্ষ প্রমাণ হিসাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে: 'একটি উপন্যাসের বিষয় নিয়ে অনেকদিন ধরে ভাবছি। একজন গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ—যার সংসার আছে, ছেলেমেয়ে আছে, সে ব্যবসা হিসেবে বেছে নিল কবর-পূজা। এ লোকটি কি রকম আচরণ

করে তা আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে' (সৈয়দ আলী ১৯৮৩: ১৫৭)। বর্তমান বিশ্লেষণের উৎস অবশ্য *লালসালু* উপন্যাস, লেখকের মন্তব্য নয়।

২. ধারণাটির পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য: মোহাম্মদ আজম ২০১৮।

৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাস অনুরূপ নান্দনিকতার উদাহরণ। বাস্তবের অতুলনীয় আয়োজনের মধ্যেই এ উপন্যাস থিমের অনুরোধে ঘটনা ও চরিত্র রচনা করেছে, আর সম্ভব করেছে অভাবনীয় প্রতীকী পাঠ। দ্রষ্টব্য: মোহাম্মদ আজম ২০০৮।

৪. *লালসালু*র পৃষ্ঠা-সংখ্যা নির্দেশিত হয়েছে 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ২০১৬' থেকে।

সহায়কপঞ্জি

আবু জাফর (১৯৮৯)। 'লালসালু: দেশকাল', *লালসালু এবং ওয়ালীউল্লাহ্* (মমতাজউদদীন আহমদ সম্পাদিত)। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশন।

জীনাত ইমতিয়াজ আলী (২০১৫)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী।

বশির আলহেলাল (১৯৮৯)। ''লালসালু' উপন্যাসে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজ-বিশ্লেষণ', *লালসালু এবং ওয়ালীউল্লাহ্* (মমতাজউদদীন আহমদ সম্পাদিত)। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশন।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (২০১৪)। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র উপন্যাস: একটি রাজনৈতিক অনুসন্ধানের ভূমিকা', *নান্দীপাঠ* (সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত)। ঢাকা।

মোস্তাক আহমাদ দীন (২০১৪)। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা', *নান্দীপাঠ* (সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত)। ঢাকা।

মোহাম্মদ আজম (২০০৮)। 'কুবের মাঝির নিয়তি ও মানিকের নিয়তিসূত্র', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শতবার্ষিক স্মরণ* (ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত)। ঢাকা: অবসর।

মোহাম্মদ আজম (২০১৮)। 'গল্পের বাস্তব ও বাস্তবের গল্প: 'সমাপ্তি' ও 'পুঁইমাচা'', *পরাণ কথা* (তাশরিক-ই-হাবিব সম্পাদিত)। ঢাকা।

রফিক কায়সার (২০১৪)। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: ঔপন্যাসিকের দায়ভার', *নান্দীপাঠ* (সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত)। ঢাকা।

শান্তনু কায়সার (২০১৪)। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র ত্রয়ী', *নান্দীপাঠ* (সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত)। ঢাকা।

সনৎকুমার সাহা (২০১৪)। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: ইতস্তত ভাবনা', *নান্দীপাঠ* (সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত)। ঢাকা।

সাজ্জাদ শরিফ (২০১৪)। 'অনাবিষ্কৃত ওয়ালীউল্লাহ্', *নান্দীপাঠ* (সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত)। ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৯৭)। *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০১৫)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য*। ঢাকা: মনন প্রকাশ।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৮৩)। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্', *সতত স্বাগত*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১৬)। *উপন্যাসসমগ্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্* (হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত)। ঢাকা: প্রতীক।

হায়াৎ মামুদ (২০১৬)। 'ভূমিকা', *উপন্যাসসমগ্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্* (হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত)। ঢাকা: প্রতীক।

হাসান আজিজুল হক (২০১৪)। 'নিজের মতো পাঠ: লালসালু', *নান্দীপাঠ* (সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত)। ঢাকা।

Tyson, Lois (2008). *Critical Theory Today: A User-Friendly Guide.* London and New York: Routledge.